৪৭তম বর্ষ ● ২য় সংখ্যা ● এপ্রিল-জুন ২০২৬

সূচিপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
আমাদের কথা		
প্রয়াত নিরঞ্জন হালদার		২
জাপানী সৈনিকের ডায়েরি	মিরু হিরানো (অনুঃ নিরঞ্জন হালদার)	৩
ভুল ধারণা	আশীষ লাহিড়ী	৪
রূপসাগরে ডুব	দীপাবলি সেন দেবরায়	৫
সবুজ দ্বীপের মৃত্যু	সুদেষ্ণা ঘোষ	৬
ইন্দোরে জলদূষণ	পার্থপ্রতিম বিশ্বাস	৯
লিমেরিটনিক	অনার্য মিত্র	১২
বিউটি পার্লার	যশোধরা রায়চৌধুরী	১৩
আইরিডোলজি	সমীরকুমার ঘোষ	২০
আকাশে বাতাসে বিষ	শঙ্কর ঘটক	২৫
রোগা হওয়ার উপায়	গৌতম মিস্ত্রী	২৮
পুস্তক পর্যালোচনা	প্রদীপ্ত গুপ্তরায়	৩০
সংগঠন সংবাদ		৩১
প্রতিবেদন		৩২

রেজিস্টার্ড অফিস : বি ডি ৪৯৪ সল্টলেক, কলকাতা- ৬৪

কার্যালয় ঃ খাদিমস বিদ্যাকুট আবাসন বি ৪, এস - ৩, পোঃ- (আর) গোপালপুর নারায়ণপুর কলকাতা- ৭০০১৩৬

ফোন : ৯৮৩০৬৫৯০৫৮/৮৯০২৪১২২৯০/৮৭৭৭০৬৬৪৭২

ওয়েবসাইট:www.utsomanush.com/

ই-মেল: utsamanush1980@gmail.com

ফেসবুক:http://www.facebook.com/utsomanush/

ISSN 0971-5800/RN.37375/80

আমাদের কথা

যুদ্ধ চলছে, তার প্রেক্ষিতে সাহিত্য-ইতিহাস-সংস্কৃতির গবেষক ও অধ্যাপক সুকুমারী ভট্টাচার্য-র 'যুদ্ধে কার লাভ?' প্রবন্ধ থেকে কিছু অংশ --- মনে পড়ে মহাভারতের দ্রোণপর্বের একটি কথা : কুকুর আর শুয়োর যখন যুদ্ধ করে মরে তখন লাভ হয় চণ্ডালের, কারণ মৃতদেহের মাংসে পেট ভরবে তারই। যুদ্ধে রাক্ষস-রাক্ষসী, অথবা পশুযুদ্ধে চণ্ডালের ভূমিকায় প্রকৃত তাৎপর্য কী—আজকের দিনে? এককথায় এরা হল, যুদ্ধোপজীবী অর্থাৎ যুদ্ধকে অবলম্বন করে যারা বেঁচে থাকে। এরা সৈনিক নয়, অস্ত্রব্যবসায়ী, শুধু এরাই সর্বান্তকরণে কামনা করে যেন যুদ্ধ দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়। অর্থনীতির সঙ্গে রাজনীতি যেখানে এক, সেখানে দেখি অস্ত্র নির্মাতারা বিধাতার মতো শক্তিমান। এরা চায় বলেই যুদ্ধ লাগে, এরা চায় বলে যুদ্ধ চলে।এদের অস্ত্র বিক্রয়ের অর্থে ধনতান্ত্রিক দেশের রাষ্ট্রপতিরা ক্ষমতায় আসে। ক্ষমতায় থাকে: এদের অস্ত্রশস্ত্র : কামান-বন্দুক, যুদ্ধজাহাজ, সাবমেরিন, গোলাগুলি দুপক্ষই কেনে। কেউ সদর রাস্তা দিয়ে কেউবা অন্যান্য রাষ্ট্রের মাধ্যমে ঘুরপথে। ...

গ্রেট নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে নগরায়ন করার লক্ষ্যে পরিবেশের যে বিপুল ক্ষয়ক্ষতি হতে চলেছে তা বোধহয় পরিবেশ নিয়ে এযাবৎ সব ঘটনাকে ছাপিয়ে গেছে। ইতিমধ্যে ন্যাশনাল গ্রীন ট্রাইবুনাল (এনজিটি) গ্রেট নিকোবর প্রকল্পকে শর্তাধীন অনুমতি দিয়েছে। আরাবল্লী পর্বতমালার ইতিমধ্যে যা ক্ষতি হয়েছে তা যাতে আর বেড়ে না যায় তা নিয়ে রাজস্থানে শ'য়ে শ'য়ে কৃষক পথে নেমেছেন। সাধারণ মানুষও সেই প্রতিবাদে সামিল হয়েছেন। শেষ পর্যন্ত শীর্ষ আদালতের রায়—সবরকম খনন বন্ধ। আরাবল্লী নিয়ে এক প্রত্নতত্ত্ববিদ -এর মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য; তাঁর সন্দেহ খুব শীঘ্রই এই প্রাকৃতিক সম্পদ শিল্পপতিদের উপঢৌকন হয়ে উঠবে। উনি লিখছেন —আরাবল্লী শুধু পরিবেশ বা বন্যপ্রাণের আশ্রয় নয়। এই পর্বতমালার গায়ে গায়ে লুকিয়ে আছে আমাদের সভ্যতার প্রাচীনতম অধ্যায়। এর পাথরে পাথরে খোদিত হয়ে আছে আমাদের পূর্বপুরুষ ও পূর্বনারীদের অস্তিত্ব রক্ষার লড়াইয়ের চিহ্ন। আদিমকালে, যখন মানব দুই পায়ে দাঁড়িয়ে মানুষ হওয়ার পথে যাত্রা শুরু করেছিল, সেই সময়কার নিদর্শন আজও ছড়িয়ে আছে আরাবল্লীর আনাচে-কানাচে। দিল্লীর লাগোয়া এই প্রত্নক্ষেত্রে মানুষ বাস করত নিম্ন পুরনো প্রস্তর যুগ থেকেই, অর্থাৎ আজ থেকে পঞ্চাশ হাজার বছর

আগে, সম্ভবত তারও পূর্বে। যদিও এই সময় নির্ধারণ বর্তমান প্রমাণভিত্তিক ব্যাখ্যার ওপর নির্ভরশীল, তবু এখন থেকে পাওয়া বিভিন্ন ধরনের পাথরের হাতিয়ার ও শিলায় অঙ্কিত চিত্র আমাদের সেই দিকেই ইঙ্গিত করে।'' তিনি দেখেছেন কীভাবে হুড়মুড় করে চলছে পাথর উত্তোলনের কাজ। পরিবেশের সঙ্গে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছে আমাদের অতীত। অদূরদর্শিতার পরিণাম কী হতে পারে তা আন্দাজ করতে গেলে যে সচেতনতা থাকা দরকার তা কী আমাদের আছে?

অস্ট্রেলিয়া বিশ্বে প্রথম দেশ, যারা ১৬ বছরের কমবয়সিদের জন্য সমাজমাধ্যম নিষিদ্ধ করতে আইনি পদক্ষেপ নিয়েছে। সম্প্রতি অন্ধ্রপ্রদেশ ও কর্ণাটক সরকার ১৬ বছরের কমবয়সি শিক্ষার্থীদের মোবাইল ফোন ও সমাজমাধ্যম ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করার কথা ঘোষণা করেছে। আমাদের এই রাজ্যে সেরকম কোনো নিয়ন্ত্রণের ইঙ্গিত এখনো পর্যন্ত শোনা যায় নি।

প্রয়াত সাংবাদিক, মানবাধিকার কর্মী ও সংগঠক নিরঞ্জন হালদারকে শ্রদ্ধা জানিয়ে একটি লেখা এই সংখ্যায় ওঁর একটি লেখা পুনঃপ্রকাশিত হল হল।

কলকাতা আন্তর্জাতিক বইমেলা, তার আগে পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি আয়োজিত সারা-বাংলা লিটল ম্যাগাজিন মেলা, লিটল ম্যাগাজিন সমন্বয় মঞ্চ আয়োজিত মেলায় প্রতিবারের মতো এবারেও উৎস মানুষ অংশ নিয়েছিল। আমাদের প্রকাশনার বই বিক্রি মন্দ হয় নি। উৎস মানুষের ওয়েবসাইট নতুনভাবে নির্মাণ করা হয়েছে। কয়েকজন শুভাকাঙ্খীর আর্থিক সহায়তায় উৎস মানুষের ওয়েবসাইট নির্মাণের খরচ কিছুটা মেটানো গেছে। উ মা

প্রয়াত নিরঞ্জন হালদার
(০১/০৭/১৯৩২-০৯/০২/২০২৬)

বিশিষ্ট সাংবাদিক ও সমাজকর্মী কলকাতা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন। বয়েসকে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিয়ে উনি দিব্যি হেঁটে-চলে বেড়াতেন। সামাজিক কাজ-কর্মে এতটুক ছেদ পড়ে নি। বেশ কয়েকটি অস্ত্রোপচারের ধাক্কা সামলে নিয়ে লেখালিখিতে ফিরে এসেছিলেন। ছোট্ট ফ্ল্যাটে একা থাকা মানুষটি নিজের কাজের ভেতর ডুবে থাকতেন। নানান বিষয়ে অগাধ পড়াশোনা ও দীর্ঘ সময় ধরে সাংবাদিকতা পেশায় থেকে বিপুল অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলেন। ৬০/৭০ বছর আগেকার ঘটনা গড়গড় করে বলে যেতেন। দেশের শুধু নয় আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি নিয়ে ওঁর বিশ্লেষণ যাঁরা শুনেছেন তাঁরা জানেন নিরঞ্জন হালদার সংবাদকে ভিন্ন দৃষ্টি নিয়ে কীভাবে দেখতেন। বইয়ের লাইনগুলো পাতা থেকে ওঁর চোখের সামনে ভেসে উঠত। রাজনৈতিক জ্ঞান ও প্রান্তিক মানুষের প্রতি দরদ সেই সঙ্গে চারপাশে ঘটে চলা বিভিন্ন বিষয় নিয়ে ওয়াকিবহাল থাকার অনন্য দৃষ্টান্ত রেখে গেলেন নিরঞ্জন হালদার। সামাজিক কুসংস্কার ও কুপ্রথার বিরুদ্ধে গণবিজ্ঞান আন্দোলনের এক সক্রিয় সমর্থক ছিলেন নিরঞ্জন হালদার। মানবাধিকার লঙ্ঘন-এর বিরুদ্ধে যেমন তেমনি আদিবাসী সমাজে ডাইনি প্রথা রদ করার আন্দোলনে ওঁর অবদান চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। উৎস মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ অনেকদিনের। লেখা দিতেন, নানান পরামর্শ দিতেন। পত্রিকা যে এতদিন ধরে চলছে তা বারবার বলতেন। মরণোত্তর দেহদান ও চক্ষুদান আন্দোলনের প্রবল উৎসাহদাতা নিরঞ্জন হালদারের দেহদান করা হয়। চোখ দুটিও দেওয়া হয়। অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে প্রয়াতের পরিবারের আপত্তিতে অঙ্গীকার থাকা সত্ত্বেও দেহদান করা যায় নি। নিরঞ্জন হালদারের পরিবার প্রয়াতের ইচ্ছাকে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন।

উ মা

এক জাপানী সৈনিকের ডায়েরি

কলেরার প্রতিশেধক

মিরু হিরানো (সেকেন্ড লেফটেনান্ট, জাপানি রেজিমেন্ট)

১৯৯৫ সালে ১৫ আগস্টে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে জাপানের আত্মসমর্পণের ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে থাইল্যান্ডের কাঞ্চনাবুরিতে কোয়ে নদীর রেল-সেতুতে গিয়েছিলাম। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় জাপানিরা যুদ্ধবন্দি ও এশিয়ার শ্রমিকদের সাহায্যে যে থাই-বার্মা রেলপথ তৈরি করেছিল, কাঞ্চনাবুরির সেতুটি নদীর দুই পারের রেলপথকে যুক্ত করে। এই রেলপথের কাহিনী অ্যালেক গিনি অভিনীত "ব্রিজ অন দি রিভার কোয়ে" ছায়াচিত্রে অমর হয়ে আছে, যদিও রেলপথ তৈরি করা ছাড়া সিনেমার কাহিনীর সঙ্গে প্রকৃত ঘটনার কোনো সম্পর্ক নেই।

যাই হোক, ঐ দিন কাঞ্চনাবুরিতে প্রচুর প্রাক্তন শ্বেতাঙ্গ যুদ্ধ-বন্দি এবং জাপান থেকে প্রচুর পর্যটক এসেছিলেন। জাপানে যুদ্ধ-বিরোধী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত এক অধ্যাপক (হাতের উপর কালো কাপড় বাঁধা) তাঁর ১৩ জন ছাত্রছাত্রীকে নিয়ে এসেছিলেন। আমিই একমাত্র ভারতীয় ছিলাম। আমাকে দেখে অস্ট্রেলিয়ার এক প্রাক্তন যুদ্ধ-বন্দি জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনিই একমাত্র ভারতীয়?" আমি তাঁকে পাল্টা প্রশ্ন করি, "কেন, অনেক ভারতীয় যুদ্ধবন্দি ছিল নাকি?" তিনি জবাব দিলেন, "অনেক! খুব কম ভারতীয় সেনা আজাদ হিন্দ ফৌজে যোগ দিয়েছিল। তাদের বেশিরভাগ দলে দলে মারা যায় ম্যালেরিয়া, কলেরা, ডাইরিয়া ও বেরিবেরিতে। তারা ইংরেজি জানত না আর জাপানি বাহিনীর অনুবাদকেরা একমাত্র বিদেশী ভাষা ইংরেজিই জানত।" পরে যুদ্ধ বন্দিদের লেখা বিবরণ থেকে জানতে পারি, তাদের সঙ্গে বন্দি কিছু ডাক্তার ছিল। সেই ডাক্তারেরা শ্বেতাঙ্গ বন্দিদের বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করত। ভারতীয় যুদ্ধ বন্দিদের সঙ্গে কোনো ডাক্তার ছিল না। তাই তারা বিনা চিকিৎসায় মারা যায়। আমার মনে প্রশ্নের উদয় হয়। কলেরা, ম্যালেরিয়া তো ট্রপিকাল কান্ট্রির রোগ। এই সব রোগের আক্রমণে কত জন জাপানি সেনা মারা গিয়েছিল? ২০০৪ সালে ব্যাঙ্ককের চুলালোঙকোণ বিশ্ববিদ্যালয়ে কলা বিভাগের কেন্দ্রীয় লাইব্রেরিতে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের বেঁচে থাকা জাপানি সৈনিকদের অভিজ্ঞতার বর্ণনার ইংরেজি অনুবাদ পড়ার সময় হঠাৎ "কলেরা" শিরোনামে লেখাটি আমার নজরে পড়ে। এখানে সেই লেখাটির বাংলা অনুবাদ ছাপা হল। —অনুবাদক।

২১৫ রেজিমেন্ট ব্রহ্মদেশের মনিওয়া শহরটি দখলের পর উত্তর-পূর্ব দিকে চলে যায়। তারপরেই আমরা মনিওয়াতে আসি। তারিখটা ছিল ১৯৪২ সালের ২ মে। আমরা ইয়ে-ঙ'র খুব কাছে চলে এসেছি এবং ইয়ে-ঙ নদীর তীরে একটি বড় গাছের নিচে অপেক্ষা করছি। এমন সময় একজন নন-কমিশনড অফিসার বারবার বমি করতে শুরু করেন। তিন-চার মিনিট অন্তর তাঁর বমির সঙ্গে সাদা তরল পদার্থ বের হতে থাকে। তাঁর হাত ও পা ঠাণ্ডা হয়ে যায়। তাঁর শরীরে আর জলীয় পদার্থ থাকে না। এটাই হচ্ছে কলেরা রোগের সূত্রপাত। এই রোগে ইঞ্জেকশান দিয়ে শরীরে জল ঢোকাতে হয়, কারণ মুখ দিয়ে জল খেলে তা বেরিয়ে আসে। ইতিমধ্যে কলেরায় আক্রান্ত আরও রোগী এসেছে। আমাদের ব্যাটেলিয়ানের উচ্চপদস্থ ডাক্তার বাহিনীর আরও লোকের মধ্যে সংক্রমণ ঠেকানোর জন্য পুরো ব্যাটালিয়ানকে পৃথক জায়গায় রাখতে চাইলেন। রোগ প্রতিরোধের জন্য তিনি আরও অনেক নির্দেশ দিলেন। মুখে চুনের জলের ছিটে দেওয়া শুরু হল। এবং খাওয়ার সময় একজন খেতে বসলে তাঁর পাশে দুজন পাখা নিয়ে মাছি তাড়াতে থাকেন।

স্যালাইন ইঞ্জেকশান দিয়ে হৃদযন্ত্রকে সচল রাখা এই রোগের একমাত্র ওষুধ। কিন্তু এজন্য অনেক বেশি পরিমাণ স্যালাইন দরকার হয়। আমাদের পুরো ব্যাটালিয়ানের সঙ্গে মাত্র ছয় বোতল স্যালাইন ছিল, যা দুজন রোগীর চিকিৎসার জন্যও যথেষ্ট নয়। ক্যাম্প-হাসপাতালে এত বিপুল সংখ্যক কলেরা রোগীর জন্য স্যালাইন তৈরি করা সম্ভব ছিল না। কারণ এজন্য আমাদের প্রচুর পরিমাণে পরিশোধিত জলের দরকার হত। তা ছিল না।

সার্জেন্ট ওইকাওয়া পরিস্থিতির মোকাবিলার জন্য বেপরোয়া হয়ে তালগাছের ফলের রস ইঞ্জেকশানের সাহায্যে শরীরে ঢুকিয়ে দিতে চাইলেন। সময় নষ্ট করার অবকাশ ছিল না। রোগীরা বিনা চিকিৎসায় মারা যাচ্ছে। বিনা চিকিৎসায় মরে যাওয়া দেখার চেয়ে তালের রস ইঞ্জেকশানের সাহায্যে শরীরে ঢুকিয়ে রোগীদের বাঁচানোর চেষ্টা করা উচিত। তালের রস ইঞ্জেকশান দিয়ে ভাল ফলই পাওয়া গেল। তারপর ব্যাটলিয়ানের সবল ব্যক্তিরা পাশের গ্রামগুলিতে গিয়ে সবুজ তাল নিয়ে এলেন। চিকিৎসা-বিভাগের কর্মীরা তালের কোয়া থেকে হাইপোডারমাইন সিরিঞ্জের সাহায্যে রস বের করে ঐ রসের সঙ্গে সামান্য নুন মিশিয়ে রোগীদের শরীরে ঢুকিয়ে দিতে থাকেন। পাঁচ থেকে আটটি কাঁচা তাল থেকে রস বের করে ইঞ্জেকশানের সাহায্যে শরীরে ঢোকানোর পর অবস্থার উন্নতি দেখা গেল। এইভাবে আমরা একটি বিপর্যয় রুখে দিতে সক্ষম হলাম। আমাদের ৭০ জন রোগীই বেঁচে গেল।

অনুবাদ ঃ নিরঞ্জন হালদার

জানুয়ারি ২০০৬

উমা

ভুল ধারণা কোথা হতে আসে?

আশীষ লাহিড়ী

বৃহদারণ্যকে ব্রহ্মন অথবা চৈতন্যকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে জলে গোলা নুন রূপে, যার প্রতিটি কণা জলে উপস্থিত কিন্তু আলাদা করে তাকে চেনবার জো নেই। বাস্তবে পরীক্ষিত ঘটনার সঙ্গে সাদৃশ্যের ভিত্তিতে এ এক অতি চমৎকার যুক্তি। তেমনি, অদেখা, সর্বময়, সর্বশক্তিমান ঈশ্বর অর্থবহ হয়ে ওঠে এই পৃথিবীতে দৃষ্ট পিতার ঐশী উপমান হিসেবে। গাঁজাখোর কিন্তু পত্নীপ্রেমিক স্বামী ও সংসার-উদাসীন কিন্তু দরদি পিতার অতুলনীয় ভাবমূর্তি শিব। যুগপৎ সংহারী ও স্নেহশীলা দুর্গা, কালী, জগদ্ধাত্রী দেবীর কল্পনা অর্থবহ হয়ে ওঠে বাস্তব সংসারের যুগপৎ সন্তানপ্রিয়া কিন্তু চ্যালাকাঠধারিণী মায়ের ভূমিকার অনুষঙ্গে। তাই দেব-দেবীদের সঙ্গে মান-অভিমান-খুনসুটি পর্যন্ত চলে, রামপ্রসাদের গান যার অপরূপ দৃষ্টান্ত। বাস্তবিক ধর্ম জিনিসটা দাঁড়িয়ে আছে এই ধরনের বাস্তব ঘটনার আধ্যাত্মিক তুলনার ওপর।

কিন্তু শুধু কি ধর্ম? বিজ্ঞানেও এই তুলনা-ভিত্তিক যুক্তি-প্রক্রিয়ার উদাহরণ প্রচুর। বহু বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের সূত্রপাত ঘটেছে এক ঘটনার সঙ্গে অন্য ঘটনার তুলনা দিয়ে, যা একটা ভাবনাকে এক ক্ষেত্র থেকে অন্য ক্ষেত্রে বহন করে নিয়ে যায়। কোপারনিকাস লিখেছিলেন, সূর্য যেন রাজা, আর তার চারপাশে গোল হয়ে ঘুরছে তাঁর অনুষদ-পার্ষদের দল, যাদের আমরা বলি গ্রহ। পৃথিবী যে সূর্যের চারপাশে ঘুরছে, কোপারনিকাসের এই ভাবনাটাকে গালিলিও সমর্থন করেছিলেন তাঁর দূরবীক্ষণ দিয়ে দেখা চাঁদের চলনের সঙ্গে পৃথিবীর তুলনা করে। অতবড়ো একটা পাথরের পিণ্ড যদি পৃথিবীর চারপাশে ঘুরপাক খেতে পারে তাহলে পৃথিবী কেন সূর্যের চারপাশে ঘুরতে পারবে না? দ্বাদশ শতকে এইরকমই যুক্তি দিয়েছিলেন ভাস্করাচার্য। তিনি বলেছিলেন, পৃথিবীর মতো একটা বস্তুপিণ্ড আকাশে নিরালম্ব ঝুলে রয়েছে। বিরোধীরা বলেন, তা কখনো হতে পারে? কেউ বা কোনো কিছু নিশ্চয়ই ওটার ভার বহন করছে। এক কথায়, পৃথিবীর একটা কোনো ধারক আধার আছে। সেই আধারটাকে বাসুকী বা অন্য কোনো সাপ বা ব্যাং বা ছাগল বা উল্লুক নাম দিলে দোষ কী? বিরোধী পক্ষের এই কাণ্ডজ্ঞান-ভিত্তিক আপত্তি শুনে ভাস্করাচার্য বলেছিলেন, সেই আধারেরও তো তাহলে আরেকটা আধার থাকতে হবে। এবং তারও, এবং তারও ...। এর কোনো অন্ত নেই। শেষ পর্যন্ত এটা যুক্তিশাস্ত্রের 'অনবস্থা দোষে' পর্যবসিত হবে। সোজা কথায়, ওটা অচল। পশুপালকরা যেভাবে কৃত্রিমভাবে পশুশাবকের জন্ম নিয়ন্ত্রণ করে, বিশেষ জাতের ভেড়া, শুদ্ধ-বংশীয় (থরো-ব্রেড) ঘোড়া কিংবা হরেক গৃহপালিত কুকুর যার পরিচিত দৃষ্টান্ত, তার সঙ্গে তুলনা করে চার্লস ডারউইন প্রাকৃতিক নির্বাচনের ধারণায় উপনীত হয়েছিলেন। মানুষের জনসংখ্যা আর খাদ্য উৎপাদন সংক্রান্ত টমাস ম্যালথস-এর একটি রচনার সঙ্গে তিনি প্রকৃতিতে বেঁচে থাকার লড়াই-এর সাদৃশ্য খুঁজে পান এবং তা থেকে প্রাকৃতিক নির্বাচনের বনেদটা তৈরি করেন।

তাহলে ধর্মের সঙ্গে বিজ্ঞানের তফাত কী? তফাত আছে। সেই তফাতটাই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতন্ত্র। বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের পথে এই তুলনাগুলি অনেকাংশেই নিছক সম্ভাব্য পথ হিসেবে, হাইপোথিসিস হিসেবে কাজ করেছে। কৃত্রিম পশু-প্রজননের ওই তুলনাগুলো প্রকৃতিতে খাটে কিনা তা যাচাই করবার জন্য ডারউইন প্রায় কুড়ি বছর ধরে সাক্ষ্যপ্রমাণ সংগ্রহ করেছিলেন। বেঁচে থাকার লড়াইয়ে কারা বেশি পটু তাদের যাচাই করেই প্রকৃতি নতুন প্রজাতি তৈরি করে—এই ধারণার সপক্ষে সমর্থন খুঁজেছিলেন। কাজেই ধর্মের সঙ্গে বিজ্ঞানের তত্ত্বর আসল তফাত হচ্ছে, তুলনা বা উপমা থেকে উৎসারিত তত্ত্বগুলিকে বিজ্ঞান শেষ পর্যন্ত পর্যবেক্ষণযোগ্য সাক্ষ্যপ্রমাণের সঙ্গে যাচিয়ে নিতে বাধ্য। ধর্মের সে-দায় নেই, সে বাধ্যবাধকতা নেই।

বাস্তব পরীক্ষানিরীক্ষার কষ্টিপাথরে নিজের বা অন্যের ধারণা বা অনুমানের ঠিক-ভুল যাচাই করে নেওয়ার এই প্রক্রিয়াটাই বিজ্ঞানকে বিজ্ঞান করে তুলেছে। ওটা বাদ দিলে শুধু বিভিন্ন বস্তুর মধ্যে তুলনাত্মক যুক্তির জোরে সিদ্ধান্ত পেশ করলে সেটা বড়ো জোর একটা অভিমত, প্রমাণিত জ্ঞান নয়। এই ব্যাপারটাকে বলা হয় "সাদৃশ্যভিত্তিক চিন্তা"। এ "এমন এক চিন্তাশৈলী যা মনে করে দুটি জিনিসের মধ্যে সাদৃশ্য থাকলেই তারা বুঝি কার্য-কারণসূত্রে গ্রথিত" (পল থ্যাগার্ড, কম্পিউটেশনাল ফিলসফি অব সায়েন্স, এম আই টি প্রেস, ১৯৮৮, পৃ ১৬২)। এটাই হল মেকি বিজ্ঞান গড়ে ওঠার প্রধান কারণ। এই 'তুলনাত্মক চিন্তার এক ছায়াচ্ছন্ন যমজ আছে যা বিজ্ঞানের বদলে মেকি বিজ্ঞানে গিয়ে পৌঁছয়'।

নিছক বাহ্য সাদৃশ্য দেখে কার্য-কারণ সম্পর্কের ধারণায় উপনীত হলে সাদৃশ্যভিত্তিক তুলনাত্মক চিন্তা শেষ পর্যন্ত জাল বিজ্ঞানের জনক হয়ে ওঠে, তা আর সৃষ্টিশীলতার উৎস থাকে না। কারণ এর ফলে অর্থ আর তাৎপর্যের অনেকগুলো অবাঞ্ছিত পরত এসে যুক্ত হয়। সাদৃশ্য দেখে কার্য-কারণ সম্পর্কে উপনীত হওয়ার তাৎপর্য হল: যেসব জিনিস বা প্রক্রিয়া দেখতে বা অনুভবে একই রকম, ধরে নেওয়া হয় যে তারা পরস্পরের প্রতি এবং বাকি বিশ্বের প্রতি একইভাবে ক্রিয়া করবে। কাজেই একটাকে বুঝতে পারলেই আপনার মনে হবে যেন অন্যটাকেও বুঝে ফেলেছেন; একটাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারলেই আপনা থেকেই যেন অন্যটাকেও নিয়ন্ত্রণ করতে পারবেন, শ্রমসাধ্য যাচাইকরণ কিংবা ভুল প্রমাণ করার প্রয়াসের আর কোনো দরকার নেই।

এর বহু দৃষ্টান্ত আছে। মঙ্গলগ্রহের পৃষ্ঠের রং লাল। রক্তের সঙ্গে সাদৃশ্যের ভিত্তিতে ধরে নেওয়া হয়, মঙ্গলগ্রহ রক্তপাত, যুদ্ধবিগ্রহ আর হানাদারি প্রভৃতি অমঙ্গলের সূচক। অপরদিকে পৃথিবীর নিকটতম , উজ্জ্বলতম, স্নিগ্ধ "সুন্দরী তুমি শুকতারা" (ভেনাস), যাকে দুবেলা চোখে দেখা যায়, সে হল সৌন্দর্য আর মাতৃত্বের প্রতীক, যদিও আসলে তা ভয়ংকর বিষাক্ত গ্যাসে ঢাকা। ধাতুজগতে সোনা যেন গ্রহজগতে সূর্য, কিংবা শরীরে যেন হৃৎপিণ্ড। সূর্য আর সোনার মধ্যে এই আলংকারিক আপাত-সাদৃশ্য থাকায় ধরে নেওয়া হয়, হৃৎপিণ্ডের উপরে সোনা ধারণ করলে তা সূর্য থেকে উপকারী শক্তি টেনে আনবে হৃৎপিণ্ডে। সাদৃশ্যভিত্তিক চিন্তাই মানুষকে ভাবতে শেখায়, যার হাতের লেখা খারাপ সে অগোছালো, হাতের তালুতে দীর্ঘ "আয়ুরেখা" দীর্ঘায়ুর দ্যোতক, প্রশস্ত-ললাট ব্রাহ্মণদের বুদ্ধি বেঁটেখাটো নাক-চ্যাপটা শূদ্রদের চেয়ে বেশি। নানা বস্তুর মধ্যে কল্পিত এইসব সম্পর্কগুলো সম্পূর্ণ গড়ে উঠেছে একমাত্রিক সাদৃশ্যভিত্তিক চিন্তার ভিত্তিতে—কঠোর নিয়মবদ্ধ, নিশ্ছিদ্র পরীক্ষার ভিত্তিতে নয়। তাই তা বিজ্ঞান নয়।

মেকি বা জাল বিজ্ঞানের সঙ্গে খাঁটি বিজ্ঞানের আসল তফাত হল, বিজ্ঞান নতুন নতুন তত্ত্বের বিকাশ ঘটিয়ে নতুন-আবিষ্কৃত তথ্যাদির ব্যাখ্যা দিতে দিতে সময়ের সঙ্গে এগিয়ে চলে। প্রয়োজনে পুরোনো তত্ত্বকে বদলে নিতে, এমনকী বর্জন করতে পিছপা হয় না। কিন্তু মেকি বিজ্ঞান মত আর প্রয়োগ উভয় বিচারের অচলাবস্থায় পড়ে থাকে। আপ্তবাক্যই তার আশ্রয়।

উমা

রূপ(কথা) সাগরে ডুব দিয়ে

দীপাবলি সেন দেবরায়

বছর চল্লিশ আগে এই উৎসমানুষ-এর পাতাতেই রূপকথা নিয়ে একটা লেখা লিখেছিলাম। রূপকথা কল্পনাবিলাসকে প্রশ্রয় দেয়, ভবিষ্যতে নতুন প্রজন্মকে আরো বাস্তবমুখী হতে হবে, শিশুসাহিত্য ও কিশোর সাহিত্যকে ঐ কল্পনাশ্রয়ী হয়ে থাকলে চলবে না। আজ না বলে পারছি না, গত চার দশকে তার ঠিক উল্টোটা হয়েছে। দেশে শুধু নয়, বস্তুবাদী পশ্চিম দেশ ক'টিতে আরো বেশি করে। একটা উদাহরণ হল, ছোটদের খেলনার বাজারে ইউনিকর্ণ বা একশৃঙ্গ-র উচ্চ চাহিদা। একান্তই যা কাল্পনিক। আর সিনেমা ও পুস্তক জগতে রাউলিং-এর সৃষ্ট জাদুকর কিশোর হ্যারি পটার-এর জয়জয়কার। আর জুরাসিক পার্ক সিরিজের চমৎকার। আরো আছে কিশোরী ভ্যাম্পায়ারিনো বা মিরাকিউলাস ধরনের টিভি শো। 'যুক্তি তক্কো'র বদলে যেখানে আছে শুধু উদ্ভট 'গপ্পো'। মানুষের মধ্যে কি যুক্তিবাদ ব্যাপারটা একেবারে ক্ষয়ে যাচ্ছে? উত্তর হয়ত যুক্তির অবক্ষয়ে নয়, প্রযুক্তির বিস্ফোরণে। গত কয়েক দশকে যার প্রভাব পারমাণবিক। তকনীকি প্রগতি (কারিগরী বিদ্যা) আমাদের কোথায় না নিয়ে যেতে পারে অন্তত একটি কালো আয়তক্ষেত্রের মাধ্যমে। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, এআই। এবার বিদেশে এসে নাতনিদেরই দেখছি আপ্লুত হয়ে বসে তা দেখছে, আবার আমাকে মাঝে মাঝে মনে করিয়ে দিচ্ছে, 'ঠাম্মা, নান্ অফ দিস্ ইস্ রিয়েল। ইট্স্ অল এ আই।' বাইরে তুষার ঝড় চলছে। স্নো হোয়াইট বা তুষার কণার রূপকথা তাদের সামনে ঠাকুমা ছাড়াই ঘটে চলেছে। আমাদের দেশের শিশু ও কিশোর সম্বন্ধে ও ভাবনা নেই। সাক্ষরতার অপেক্ষা না রেখেই এই রূপকথা তাদের কাছে পৌঁছে যাবে, বহুতল আবাস থেকে ঝোপড়পট্টি। এ যে বিশ্বের ভারতী। বিশেষ করে এই বিশ্বায়নের যুগে। ড্রাগন, ইউনিকর্ণ, পক্ষীরাজ, তুষারকণা, অরুণ-বরুণ-কিরণমালা এস সবাই, কল্পনাও মনুষ্য-মস্তিষ্ক প্রসূত। সে যে চিরদিন কল্পনাই থেকে যাবে, এই ধারণায় অনড় থাকাও কি একটা সংস্কার মাত্র? যুগ অনুসারে সুপারস্ট্রাকচার বা অধিরচনাও তো বদলে যায়। মার্কস কি বলতেন?

উমা

সবুজ দ্বীপের মৃত্যুর পরওয়ানা

সুদেষ্ণা ঘোষ

পটভূমি : গ্রেট নিকোবর কথাটি উচ্চারণ করলেই আমাদের মনে ভেসে ওঠে একটি প্রাচীন বনভূমি আচ্ছাদিত সবুজ দ্বীপ। নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের বৃহত্তম ও দক্ষিণতম দ্বীপ, গ্রেট নিকোবর, ঘন গ্রীষ্মমণ্ডলীয় রেইন ফরেস্ট, পাহাড়, নদী এবং সমৃদ্ধ জীববৈচিত্র্যের জন্য বিখ্যাত; শম্পেন ও নিকোবরি আদিবাসীদের আবাসস্থল।

নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ ভারতীয় মহাসাগরের পূর্বের দিকে ইন্দোনেশিয়ার সুমাত্রা দ্বীপের উত্তরে, মালাক্কা প্রণালীর (বিশ্বের ব্যস্ততম শিপিং লেনের) কাছে অবস্থিত — পূর্বে আন্দামান সমুদ্র এবং পশ্চিমে বঙ্গোপসাগর। এই অবস্থান কৌশলগতভাবে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। চীনের বহু প্রচারিত স্ট্রিং অফ পার্লস্ কৌশলগত নীতির পরিপ্রেক্ষিতে আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের রাজনৈতিক ও বাণিজ্যিক গুরুত্ব খুবই বেড়ে গেছে। এই স্ট্রিং অফ পার্লস-এর অর্থ হল ভারতীয় মহাসাগরে সামরিক ও বাণিজ্যিক পরিকাঠামো এবং প্রতিষ্ঠানের এক নেটওয়ার্ক তৈরি করা। ভারতীয় মহাসাগরে এই দ্বীপপুঞ্জের অবস্থানের জন্য ভারতবর্ষ প্রশান্ত মহাসাগর ও ভারতীয় মহাসাগরের উপরে নজরদারি রাখতে পারে।

এখানে বলে রাখা প্রয়োজন যে এই ৯১০ বর্গ কিলোমিটার আয়তনের ছোট দ্বীপটি আদিবাসীদের জন্য সংরক্ষিত ভূমি এবং অনন্য জীববৈচিত্র্যের ও বহু এন্ডেমিক (যেসব প্রজাতি শুধু একটি এলাকাতে সীমিত—যেমন গ্রেট নিকোবর দ্বীপ) প্রজাতির বাসস্থল। এই দ্বীপে দু-দুটি বড় মাপের ন্যাশনাল পার্ক আছে এবং দ্বীপটি সুন্ডাল্যান্ড বায়ো-ডাইভারসিটি হটস্পট-এর একটি অংশ। ২০১৩ সালে ইউনেস্কো এই দ্বীপটিকে জীবমণ্ডল সংরক্ষণ এলাকা (বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভ) হিসেবে স্বীকৃতি দেয় (সেখসারিয়া, ২০২৪)।

২০০৪-এর স্মৃতি : ২০০৪ সালে অখ্যাত এই ছোট গ্রেট নিকোবর দ্বীপটি প্রথম সংবাদ মাধ্যমের নজর কাড়ে এক ভয়ঙ্কর ভূমিকম্প ও সুনামির পরে। কেন হয়েছিল এই সুনামি? সেটা বোঝার জন্য আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের ভূতাত্ত্বিক অবস্থানের দিকে তাকানো দরকার।

আন্দামান-নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ ভারত-অস্ট্রেলিয়ান প্লেট ও ইউরেশিয়ান প্লেটের সংঘর্ষের ফলে গঠিত এবং এই অঞ্চলটির ভাঁজ ও চ্যুতি এখনো সক্রিয়। এই টেকটনিক প্লেটের সংঘাতের কারণে ২০০৪ সালের ২৬ ডিসেম্বর সুমাত্রা উপকূলের কাছে সমুদ্রের নিচে এক ভয়াবহ ৮ মিনিট ব্যাপী ভূমিকম্প হয় (মোমেন্ট স্কেলে যার মাত্রা ৯.১-৯.৩)। এই ভূমিকম্প জন্ম দেয় এক বিশাল বিধ্বংসী সুনামির যা ভারত সহ ১৮টি দেশের উপকূলে ধ্বংসলীলা চালায়। আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়, উপকূলীয় অঞ্চলগুলি ভেসে যায় এবং এই সময় গ্রেট নিকোবর মিটার পাঁচেক জলের তলায় চলে গিয়েছিল। বহু মানুষের প্রাণহানি ঘটে এবং বলা বাহুল্য যে এই সময় দ্বীপের অন্যান্য বাসিন্দাদের সঙ্গে আদিবাসীদেরও অন্যত্র আশ্রয় দেওয়া হয়। ইন্দিরা পয়েন্টের লাইট হাউসটি, যা কিনা পূর্বে সর্বোচ্চ জোয়ারের উপরে থাকত, আজ ২১ বছর পরেও সম্পূর্ণভাবে আন্দামান সাগরের জলে ঘেরা রয়েছে।

গ্রেট নিকোবর প্রকল্প : গ্রেট নিকোবর দ্বীপটি আবার সংবাদমাধ্যমের শিরোনামে এসে হাজির হয়। এবারের কারণটা প্রাকৃতিক দুর্যোগ নয়, বৃহৎ উন্নয়ন প্রকল্পের সরকারি উদ্যোগ। এই উদ্যোগ নিয়ে অনেকেই উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন এবং করছেন। সে কথায় পরে আসবো, আগে দেখা যাক কি সেই প্রকল্প।

এই প্রকল্পের পোশাকি নাম হোললিস্টিক ডেভেলপমেন্ট অফ গ্রেট নিকোবার আইল্যান্ড (গ্রেট নিকোবর দ্বীপের সার্বিক উন্নয়ন প্রকল্প)। এই প্রকল্পের কেন্দ্রে থাকবে একটি আন্তর্জাতিক নৌ-পন্যান্তর বন্দর (ইন্টারন্যাশনাল ট্রান্সশিপমেন্ট পোর্ট) যা গালাথিয়া উপসাগরে গঠন করা হবে। এছাড়াও থাকবে একটি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, একটি বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র এবং একটি গ্রিনফিল্ড শহর ও পর্যটন প্রকল্প। এই প্রকল্প ১৬০ বর্গ কিলোমিটার জমির উপরে তৈরি করা হবে, এবং তার মধ্যে যে ১৩০ বর্গ কিলোমিটার আদিম ঘনবর্ষণ বনাঞ্চল (ট্রপিকাল রেইনফরেস্ট) কেটে ফেলা হবে, সেটি ইউনেস্কো স্বীকৃত সংরক্ষিত বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভ। এই প্রকল্পকে ২০২২ সালের

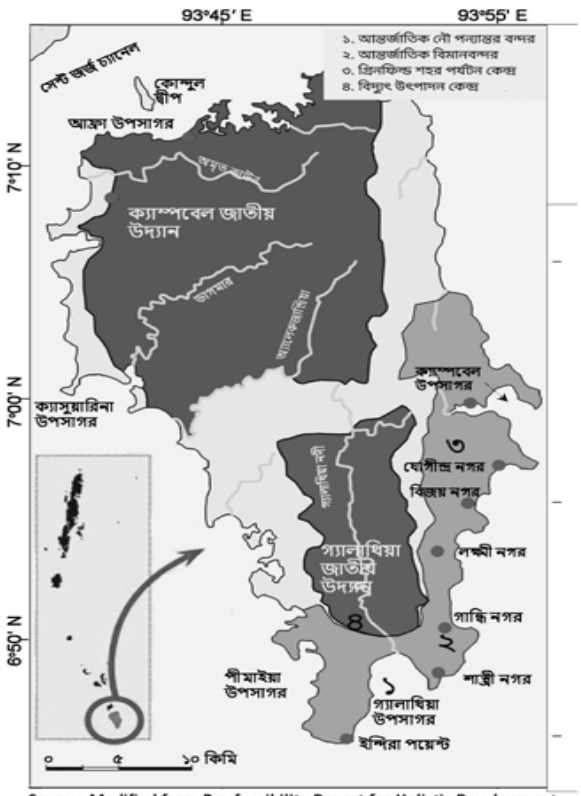

Source: Modified from Pre-feasibility Report for Holistic Development of Great Nicobar Island at Andaman and Nicobar Islands AECOM (2021) & Chaudhuri Subhamita (2025)

১১ নভেম্বর, প্রকল্পটির সূত্রপাতের ঠিক ২ বছরের মাথায়, চূড়ান্ত পর্যায়ের পরিবেশগত ছাড়পত্র (EC) দিয়ে দিয়েছে কেন্দ্রীয় পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রক (MoEFCC)। আগামী ৩ দশক ধরে এই প্রকল্পের কাজ চলবে। এই পুরো প্রকল্পের জন্য আনুমানিক খরচ ৮১০০০ কোটি টাকা (২০২৪)। সম্পূর্ণ পরিকল্পনার মূল দায়িত্বে আছে নীতি আয়োগ (NITI Aayog) এবং পোর্টব্লেয়ার অবস্থিত আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ যৌথ উন্নয়ন কর্পোরেশন (ANIIDCO) এটিকে রূপ দেবে (সেখসারিয়া, ২০২৪; সেখসারিয়া ২০২৫)।

এসব কিছু করার পেছনে কেন্দ্রীয় সরকারের যুক্তি—প্রত্যন্ত ঐ দ্বীপের এবং ওখানে বসবাসকারী মানুষদের প্রগতি এবং উন্নয়নের খুবই প্রয়োজন। প্রকল্প হলে পর্যটন বাড়বে, আয় বাড়বে এবং এলাকার অর্থনৈতিক উন্নতি হবে। এছাড়া ভারতীয় মহাসাগরে চীন যাতে একক আধিপত্য স্থাপন করতে না পারে তার দিকেও তো ভারতের নজর দেওয়া দরকার! প্রতিরক্ষা আজকাল মানবাধিকার, পরিবেশ রক্ষা এসবের থেকেও বেশি প্রয়োজনীয়, তাই এই বড় প্রকল্পের জন্য পরিবেশ রক্ষার দায়িত্বে থাকা প্রায় সব সংস্থার কাছ থেকে সহজেই ছাড়পত্র পেয়ে গেছে কেন্দ্রীয় সরকার।

গত বছরে ১২ সেপ্টেম্বর কেন্দ্রীয় পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রী ভূপেন্দ্র যাদব গ্রেট নিকোবর প্রজেক্ট নিয়ে উদ্বিগ্ন বিভিন্ন বিজ্ঞানী, পরিবেশবিদ ও সমাজ বিজ্ঞানীদের চিন্তা দূর করতে বলেছিলেন যে দেশের কৌশলগত নীতি এবং প্রতিরক্ষার স্বার্থে এই প্রজেক্টটি খুবই জরুরি। এটি গ্রেট নিকোবর দ্বীপটিকে ভারতীয় মহাসাগরের জল ও বিমান পরিবহনের কেন্দ্রস্থল করে তুলবে। এই প্রজেক্টটিকে একাধিক স্তরের যাচাই-বাছাই করেই ছাড়পত্র দেওয়া হয়েছে। এতে শম্পেন ও নিকোবরি আদিবাসীদের স্থানচ্যুত করা হবে না। এটাও বললেন যে প্রজেক্ট-এর জন্য যে ৩৬.৭৫ বর্গ কিলোমিটার রেনফরেস্ট ব্যবহার করা হবে আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপের মোট বনাঞ্চলের মাত্র ১.৮২%।

উন্নয়ন না বিপর্যয়? : তবুও বেশ কিছু মানুষ এই প্রকল্পের বিরুদ্ধে এখনো সরব। এঁরা কি তবে দেশদ্রোহী? আসুন শোনা যাক এঁদের যুক্তি।

প্রথমত, এই প্রকল্পটি মূলত বাণিজ্যিক—কিছু উপরতলার মানুষদের মুনাফার জন্য করা হচ্ছে। প্রকল্পের জন্য বরাদ্দ ১৬০ বর্গ কিলোমিটারের মাত্র ৫% প্রতিরক্ষার স্বার্থে ব্যবহার করা হবে। বাকি জায়গায় আন্তর্জাতিক নৌ-পণ্যান্তর বন্দর, আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র, গ্রিনফিল্ড শহর এবং শহরবাসী ৩.৫ লাখ মানুষের জন্য বাজার, দোকান, হাসপাতাল, স্কুল ইত্যাদি তৈরি করা হবে। এই মুহূর্তে দ্বীপে মাত্র ৮০০০ মানুষ বসবাস করে (সিভিল সোসাইটি ২০২৫)। সেই সংখ্যা পরবর্তী ৩০ বছরে বেড়ে ৩.৫ লাখ হলে এই দ্বীপের প্রাকৃতিক ভারসাম্য কি বজায় থাকবে?

দ্বিতীয়ত, শ্রী ভূপেন্দ্র যাদবের ১.৮% বনাঞ্চল কাটার হিসাব বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে ঠিক নয়। শুধুমাত্র গ্রেট নিকোবর দ্বীপের বনাঞ্চল নিয়ে হিসাব করা উচিত এবং সেই হিসেবে প্রকল্পের জন্য ১৫% বনাঞ্চল কাটা হবে। নিয়ম অনুযায়ী এক জায়গায় জঙ্গল কাটলে অন্য জায়গায় কমপ্লেনশেটরি এফরেস্টেশন করা উচিত। রেইনফরেস্টের প্রায় দশ লক্ষ গাছ কেটে ২০০০ কিলোমিটার দূরে সুদূর, শুষ্ক হরিয়ানাতে গাছ লাগানো (ট্রি-প্লান্টেশন) হবে। কেন্দ্রীয় সরকারের পরিবেশ, বনাঞ্চল এবং জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রক এবং ফরেস্ট

অ্যাডভাইজারি কমিটি কিভাবে এর ছাড়পত্র দিলেন? রেনফরেস্ট এবং প্লান্টেশন কি এক? এই দ্বীপের কাজের সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত শ্রী পঙ্কজ সেখসারিয়ার মতে, "ক্রমবর্ধমান জলবায়ু সংকটের মধ্যে দাঁড়িয়ে আমরা একটা প্রাচীন অরণ্য আর তার দশ লক্ষ গাছ আর জীববৈচিত্র্যের বিস্ময়কর সম্ভার এবং এই গ্রহের বাস্তুতান্ত্রিক ইতিহাসের একটি অপূরণীয় অধ্যায়কে নস্যাৎ করা চুক্তিতে সই করে দিলাম" (সেখসারিয়া, ২০২৪)।

এছাড়া যে গলাথিয়া উপসাগরে এই বন্দর তৈরি করা হবে সেটি বড় মাপের সমুদ্রবাসী কচ্ছপ (জায়েন্ট লেদারব্যাক টার্টলদের) ডিম পাড়ার একটি বিশেষ অঞ্চল। মানুষের আবির্ভাবের বহু লক্ষ বছর আগে থেকেই সুদূর অস্ট্রেলিয়া এবং আফ্রিকার উপকূল থেকে এদের আসা-যাওয়ার আচার। তাই ১৯৯৭ সালে গালাথিয়া উপসাগরকে ওয়ার্ল্ডলাইফ স্যাংচুয়ারি ঘোষণা করা হয়েছিল। অথচ ২০২১ সালে ন্যাশনাল বোর্ড ফর ওয়াইল্ড লাইফ (NBWL) বন্দর নির্মাণের সুবিধার্থে ওই অভয় অরণ্যটাকে ডিনোটিফাই করেছিল আর সেই ডিনোটিফিকেশন অনুমোদন করেছিল ওয়াইল্ড লাইফ ইনস্টিটিউট অফ ইন্ডিয়া (WII) (সেখসারিয়া, ২০২৪)।

এই প্রকল্পের জন্য ২০৬৬৮টি প্রবাল (কোরাল) কলোনির মধ্যে ১৬১৫০টি প্রবাল কলোনি স্থানান্তরিত করা হবে। বাকি ৪৫১৮টি প্রবাল কলোনির ওপর কি প্রভাব পড়বে তার কোনো উল্লেখ নেই। জুলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার (ZSIএর) পরিচালক অবশ্য বলেছেন যে গ্রেট নিকোবর দ্বীপের প্রবাল সুরক্ষিত করা নাকি সম্ভব। তবে বিজ্ঞানী মনীষ চণ্ডীর মতে NGT যে পদ্ধতিতে প্রবাল প্রতিস্থাপন করার কথা বলেছে তার মধ্যে গুরুতর ত্রুটি রয়েছে (পেরিঞ্চেরি, ২০২৩)।

তৃতীয়ত, এই প্রকল্পের জন্য শম্পেন ও নিকোবরি অদিবাসীদের অধিকার কেড়ে নেওয়া হচ্ছে। ২০০৪-এর সুনামির পরে তাঁদের অন্য জায়গায় পুনর্বাসন দেওয়া হয়। পরে তাঁদের নিজেদের গ্রামে ও জঙ্গলে ফেরার কথা ছিল। কিন্তু আজও ২১ বছর পরে তাঁরা কায়িক শ্রমের মূল্যে জীবিকা নির্বাহ করছেন এবং কষ্টকর জীবন যাপন করছেন। তাঁদের নিজেদের গ্রামে ও জঙ্গলে ফিরে যাওয়ার ইচ্ছাকে কোনো মূল্যই দেওয়া হচ্ছে না। শুধু তাই নয়, ওঁদের ঘোর আপত্তি সত্ত্বেও ওঁদের জমি কেড়ে নেওয়া হচ্ছে এবং ওঁরা বহু যুগ ধরে যেভাবে জীবনধারণ করতেন সে পথ বন্ধ হতে চলেছে (সিভিল সোসাইটি, ২০২৫)। এই প্রকল্পটি দ্বীপের অন্যান্য অধিবাসীদের কোনো বাড়তি সুবিধা আনবে কি? তাঁদের মৌলিক চাহিদা যেমন হাসপাতাল, স্কুল, পরিবহন ব্যবস্থা, জ্বালানি, এই সব সমস্যার এত বছরেও সমাধান করা হয় নি।

চতুর্থ, ভারতীয় মহাসাগরের অনেক দেশেই আধুনিক বন্দর আছে এবং নিকোবরের বন্দরটিকে সেই সকল বন্দরের সঙ্গে পাল্লা দিতে হবে। যে ৮১,০০০ কোটি টাকার কথা বলা হয়েছে সেই অঙ্কটি আরো অনেক বাড়বে। সবচেয়ে জরুরি প্রশ্ন এই যে একটি ভঙ্গুর, ভূতাত্ত্বিক অঞ্চলে এরকম একটি বড় প্রকল্প কিভাবে পরিবেশ রক্ষার দায়িত্বে যে সকল দপ্তর আছে তাদের সবার থেকে ছাড়পত্র পেল? বন্দরটি এমন একটি স্থানে অবস্থিত হতে চলেছে যেখানে প্রতি বছর প্রায় ৪৪টি ভূমিকম্প অবশ্যম্ভাবী (অন্ধারিয়া, রমেশ ও ধিমান, ২০২৩)। তবুও জেনেশুনে এরকম একটি প্রাকৃতিক দুর্যোগপ্রবণ এলাকাতে এক বিশাল খরচে একটি বিশাল বন্দর, আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র, গ্রীনফিল্ড শহর ও পর্যটন কেন্দ্র তৈরি করার দিকে নিদ্বির্ধায়, দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে চলেছেন কেন্দ্রীয় সরকার।

সবশেষে, রিটায়ার্ড অ্যাডমিরাল অরুণ প্রকাশ— যিনি একসময় আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপের আর্মি, নেভি, এয়ারফোর্স এবং কোস্ট গার্ডের জয়েন্ট কমান্ডে ছিলেন—একথা জানান যে গ্রেট নিকোবর দ্বীপের পূর্বে একটি ছোট এয়ারপোর্ট, একটি নেভেল এয়ার স্টেশন, একটি ছোট পোর্ট এবং আর্মির একটি ছোট গ্যারিসন মজুত আছে। এখানে মিলিটারি শক্তি বাড়ানো অবশ্যই প্রয়োজন, তবে তার জন্য অনেক জমি অন্য দ্বীপে আছে। গ্রেট নিকোবর দ্বীপের ইকোলজিকাল সম্ভার নষ্ট না করে, আদিবাসীদের উচ্ছেদ না করেও এই এলাকায় মিলিটারি শক্তি বাড়ানো যায় (সেখসারিয়া, ২০২৫)। যে বিশাল গ্রীনফিল্ড শহর এবং পর্যটন কেন্দ্র গড়ার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে, তা যে দেশ রক্ষার স্বার্থে নয়, কিছু উপরতলার মানুষদের স্বার্থে, এটা বোঝা কি খুব কঠিন ব্যাপার?

সম্পূর্ণ ন্যায়নীতিহীন এই সরকারি উদ্যোগ সর্বগ্রাসী পুঁজিবাদের (প্রিডেটরি ক্যাপিটালিজমের) একটি জ্বলন্ত উদাহরণ। কাদের উন্নয়নের জন্য এই প্রজেক্ট? এটা কি সত্যিই উন্নয়ন না বিপর্যয়?

তথ্যসূত্র :

•Andharia, J., V. Ramesh and R. Dhiman (2023): "Disregarding Risk" in Sekhsaria, P. curated. The Great Nicobar Betrayal - Pushing a Vulnerable Island knowingly into disaster, THG Publishing Pvt. Ltd., Chennai, pp. 20-23.

•Chaudhuri Subhamita (2025): "Great Nicobar Dwiper Abosthan Manchitro", in Ghorai Narayan (ed.) Great Nicobar Prokolpo o Kichu Proshno, Virasat Trade, Kolkata, p. 117.

•Great Nicobar Island Project (2025): Digital Current Affairs, https://visionias.in/current-affairs/monthly-magazine/2025-10-04/environment/great-nicobar-island-project

•Great Nicobar: Experts take on minister in joint letter (2025): Civil Society, New Delhi, https://civilsocietyonline.com/spotlight/great-nicobar-experts-take-on-minister-in-joint-letter/

•Perinchery, A.(2023): "NGT's Disappointing Stand", in Sekhsaria, P. curated. The Great Nicobar Betrayal - Pushing a Vulnerable Island knowingly into disaster, THG Publishing Pvt. Ltd., Chennai, pp. 15-19.

•Sekhsaria, P. ed. (2025): Island on Edge - The Great Nicobar Crisis, Westland, Chennai, 241p.

•Sekhsaria, P. curated. (2024): The Great Nicobar Betrayal - Pushing a Vulnerable Island knowingly into disaster, THG Publishing Pvt. Ltd., Chennai,100p.

উমা

ইন্দোরে জলদূষণে মৃত্যু ঃ আমরা নিরাপদ তো?

পার্থপ্রতিম বিশ্বাস

ছোটবেলা থেকেই বর্ণহীন, গন্ধহীন সেই তরল যাকে মানুষ চিনেছে বেঁচে থাকার আবশ্যিক উপাদান হিসেবে, আজ সেই জল, বিশেষত পানীয় জলের জোগান নিয়েই তৈরি হচ্ছে প্রবল শঙ্কা! এ দেশের বেড়ে ওঠা নগরজীবনে নগরায়নের দাপট বাড়ার সাথে সাথেই দেশের ছোট বড় শহরগুলোতে হৈ হৈ করে বাড়ছে জনঘনত্ব। ফলে সেই বাড়তি জনঘনত্ব সামাল দিতে বাড়ছে জলের চাহিদা। স্নানের জল থেকে পানের জল, কৃষির জল থেকে শিল্পের জল, উত্তরোত্তর মহার্ঘ হয়ে উঠেছে দেশ জুড়ে। শুধু জলের পরিমাণ নয় বরং জলের গুণমান নিয়েও তৈরি হচ্ছে নিত্যনতুন আশঙ্কা। যে আশঙ্কা আরো বেশি ঘনিয়ে উঠেছে দেশের অন্যতম পরিচ্ছন্ন এবং আধুনিক শহর ইন্দোরের সাম্প্রতিক দূষিত পানীয় জলের ধাক্কায় শিশু সহ পনেরো জন মানুষের মৃত্যুতে।

বেহাল স্মার্ট সিটি: সাম্প্রতিককালে দেশের পুরনো শহরগুলির পরিকাঠামোর মান উন্নয়নের লক্ষ্যে ঘোষিত হয়েছিল স্মার্ট সিটি প্রকল্প। যে প্রকল্পের মূল লক্ষ্য হয়ে উঠেছে দ্রুত নগরায়ন বৃদ্ধির সাথে সঙ্গতি রেখে বাছাই করা দেশের বেশ কিছু শহরের প্রযুক্তিনির্ভর পরিষেবা ও পরিকাঠামোর উন্নয়ন। উন্নয়নের সেই মাপকাঠিতে রয়েছে শহরের নিকাশি থেকে আবাসন পরিবহন থেকে পরিবেশ কিংবা বিদ্যুতায়ন থেকে পানীয় জলের মতো শহর জীবনের অতি আবশ্যিক উপাদানগুলি। দেশজুড়ে ঝাড়াই-বাছাই করা এমন শহরগুলি কার্যত এদেশের শহুরে উন্নয়নের আধুনিক মডেল হয়ে উঠেছে। কিন্তু এমন মডেল শহরগুলির অন্যতম ইন্দোরেই পানীয় জলের দূষণের ঘটনায় শিশুসহ পনেরো জন মানুষ প্রাণ হারিয়েছে। শ'য়ে শ'য়ে মানুষকে হাসপাতালে ভর্তি করাতে হয়েছে তাদের প্রাণ বাঁচাতে। কেবল ইন্দোর নয় দেশের আরেক স্মার্ট সিটি গান্ধীনগরেও কোটি কোটি টাকা খরচ করে নতুন জল প্রকল্পের নলবাহিত জলে দূষণের দাপটে ত্রাহি ত্রাহি রব ছাড়ছে মানুষ। ফলে দেশের এমন আধুনিক স্মার্ট শহর জুড়েই যদি জলাতঙ্কের বহর বেড়ে চলে সেখানে দেশ জুড়ে ছোট-বড়-মেজো শহরগুলির কোটি কোটি মানুষ যে বিপদের প্রহর গুনছে প্রতিনিয়ত সে আর বলার অপেক্ষা রাখে না। ইতিমধ্যে দেড়শ কোটি মানুষের দেশে ৩৬%-এর বেশি মানুষ শহরে বাস করছে। অনুমান আগামী পাঁচ বছরে সেই মানুষের সংখ্যা ৪০ শতাংশে পৌঁছাবে। ফলে বিশুদ্ধ জলের চাহিদা সামাল দিতে না পারলে যে দেশের শহুরে মানুষের জীবন বেসামাল হতে পারে সাম্প্রতিক জল দূষণের বিপর্যয় তারই ইঙ্গিতবাহী। কিন্তু সাম্প্রতিক জল দূষণ বিপর্যয়ের পর স্পষ্ট হল যে শহর জুড়ে উন্নয়নের প্রদীপের নিচে অন্ধকারের মতোই রয়ে গিয়েছিল সেই শহরের পানীয় জলের পরিকাঠামো। ইতিমধ্যে প্রমাণিত যে বিশুদ্ধ পানীয় জল পরিবাহী পাইপ লাইনের একেবারে কান ঘেঁষে তৈরি হয়েছিল সেই অঞ্চলের শৌচালয়। আর শৌচালয়ের নিকাশি পাইপ ফুটো হয়ে বিষাক্ত তরল বর্জ্য পদার্থ, নিকটস্থ পানীয় জলের পাইপ লাইনের ফাটল দিয়ে গিয়ে মিশে ছিল পাইপের পানীয় জলের

সাথে। ফলে দূষিত বিষাক্ত পানীয় জল হাজারে হাজারে মানুষ পান করার পরিণতিতেই বেঘোরে বহু মানুষের প্রাণ গেল।

নলবাহিত জল পরিবহন : আজ এটা বলার অপেক্ষা রাখে না যে এদেশে নলবাহিত জলের প্রায় ৪০% নষ্ট হয় সেই জল পরিবহন ব্যবস্থার পরিণতিতে। নলবাহিত জল নষ্টের অন্যতম কারণ পাইপ লাইনের ফাটল। ইস্পাত কিংবা কংক্রিটের পাইপ লাইন মাটির নিচ দিয়ে বসানো হয় বলেই মাটিচাপা পড়া সেই লাইনের ফাটল, সাধারণভাবে ভূপৃষ্ঠে খালি চোখে ধরা পড়ে না। পাইপের উপরের মাটি জলে ভিজে উঠলে কিংবা ধসতে শুরু করলে আমজনতার নজরে আসে ভূপৃষ্ঠের নিচে পাইপে ফাটল। এমন পাইপগুলির বয়স বাড়ার সাথে সাথেই বাড়তে থাকে পাইপগুলির ফাটলের বিপদ। ফলে ভূপৃষ্ঠের উপর থেকে অধরা ঐ পাইপ লাইনের ফাটলের ছিদ্রপথে বিশুদ্ধ জলের সাথে মাটির নিচে ছড়িয়ে থাকা দূষিত জল মিশে গেলেই তৈরি হয় জল দূষণের বিপদ। সেই কারণেই মাটির নিচে পানীয় জলের পাইপের নিকটবর্তী অঞ্চল দিয়ে নিকাশি পাইপ বসানো উচিত নয়। অথচ শহরের স্থানাভাবের কারণে হামেশাই রাস্তার নিচ দিয়ে এমন বিভিন্ন ধরনের পাইপ যেমন জলের পাইপ, নিকাশির পাইপ, গ্যাসের পাইপ, বিদ্যুতের পাইপ গা ঘেঁষাঘেষি করেই বসানো হয়। ফলে সে ক্ষেত্রে নিকাশি পাইপ ভূপৃষ্ঠের নিচে ফেটে গেলে ওই নিকাশিতরল মাটির সাথে মিশে ভূপৃষ্ঠের নিচের জলকে বিষাক্ত করে তোলে। আমাদের শহর কলকাতাতেও বহু অংশে এমন বিভিন্ন পাইপের সহাবস্থান রয়েছে ভূপৃষ্ঠের নিচে অল্প পরিসরে। ফলে যে শহরে পানীয় জল থেকে নিকাশি নালার পাইপগুলি মূলত যেখানে রাস্তার নিচ দিয়ে ছুটে চলে সেখানে প্রযুক্তি নির্ভর উপায়ে ওই পাইপগুলির ফাটলের ভৌগোলিক অবস্থান এবং ব্যাপ্তি নজরবন্দী করা প্রয়োজন।

বলাই বাহুল্য ইন্দোর 'ক্লিন সিটি'র তকমা পেলেও সেই শহরের ভগিরথপুরা অঞ্চলে পাইপের ওই ফাটল নির্ধারক ব্যবস্থা ছিল না কিংবা থাকলেও অকেজো হয়েছিল। এমনকি ঐ অঞ্চলে জলের পাইপ লাইনগুলি ৪৫ থেকে ৫০ বছরের পুরনো হওয়া সত্ত্বেও সেগুলির নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা হয় নি। ফলে শৌচাগারের পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে থাকা মাটির নিচে পানীয় জলের পাইপ লাইনের স্বাস্থ্যে নজর এড়িয়ে যাওয়ায় এই ভয়াবহ বিপত্তি ঘটেছে। এমন প্রেক্ষিতে কলকাতা সহ দেশের প্রতিটি জনবহুল শহরেই পানীয় জল ও নিকাশি পাইপ লাইনের নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও ফাটল নির্ণয়ের প্রযুক্তিনির্ভর পরিকাঠামো তৈরি করা উচিত। যাতে করে শহরের এক একটি অঞ্চলের কন্ট্রোলরুমে বসেই ভূপৃষ্ঠের নিচে বিভিন্ন পাইপ লাইনের ফাটলের যাবতীয় তথ্য হাতের মুঠোয় নিয়ে আসা যায়।

জলদূষণে আক্রান্ত নদীর জল : নলবাহিত জল দূষণের ক্ষেত্রে পাইপের ফাটল যেমন একদিকে প্রাসঙ্গিক তেমনি প্রাসঙ্গিক জলের উৎসমুখে দূষণের বিপদ। এদেশ নদীমাতৃক দেশ হলেও দেশের জনসংখ্যার নিরিখে ভূপৃষ্ঠে মিষ্টি জলের উৎসের পরিমাণ যথেষ্টই কম। গোটা বিশ্বের ১৭% মানুষের বাস এদেশে হলেও বিশুদ্ধ মিষ্টি জলের উৎস রয়েছে গোটা বিশ্বের কেবল ৪%। ফলে এটা স্পষ্ট যে এদেশ নদীমাতৃক হলেও নদীর জলের চাহিদা এবং যোগানের ফারাক বিস্তর। পাশাপাশি নদীর জলের গুণগত মান জনজীবনে ব্যবহৃত জলের কাঙ্ক্ষিত মানের তুলনায় যথেষ্টই খারাপ। ফলে নদীর জল দ্রুত পরিশ্রবণ করে শহর, শহরতলীতে সরবরাহ করার ক্ষেত্রে বাড়তি সতর্কতা জরুরি। ইতিমধ্যে কেন্দ্রীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের সমীক্ষায় দেশের ২১১৬টি স্থানে বিভিন্ন নদনদীর বিভিন্ন অংশের মধ্যে ২৯৬টি স্থানে জল দূষণের প্রমাণ মিলেছে। যার অর্থ দেশের ১৫.৬৭% নদীর জল দূষিত। এমনকি কুম্ভমেলার মতো উৎসব স্থলেও উচ্চ পর্যায়ের সরকারি সতর্কতা সত্ত্বেও জলের গুণগত মান স্নানের নিরিখে দূষিত ছিল বলেই অভিযোগ উঠে এসেছে। পাশাপাশি বায়ো কেমিক্যাল অক্সিজেন ডিম্যান্ডের নিরিখে দেশের ৩৮% নদীর জল বিপজ্জনক মাত্রায় রয়েছে। বহু আইনি বিধিনিষেধ চালু করার পরেও নদীকেন্দ্রিক নগর জীবনের শিল্প এবং নিকাশি বর্জ্য অপরিশোধিত অবস্থায় এখনও প্রতিদিন এসে জমা হয় দেশের এই নদীবক্ষেই। এই অবস্থায় নদীর জলকে নগর জীবনে প্রয়োজনে নলবাহিত উপায়ে ব্যবহার করার ক্ষেত্রে দূষিত জলের ঝুঁকিও উত্তরোত্তর বাড়ছে। বাড়ছে জল পরিশোধনের খরচ।

জলদূষণে ঝুঁকি কৃষিতে : কৃষিভিত্তিক এই দেশে মানুষের খাদ্য চাহিদার মূল শস্য কিংবা সবজি উৎপাদনের ক্ষেত্রে প্রচুর জলের প্রয়োজন। ফলে দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে, বর্ধিত খাদ্য চাহিদাকে সামাল দিতে কৃষি উৎপাদনের বৃদ্ধির সাথে সাথেই দেশে বেড়ে চলেছে জলের চাহিদা। এই মুহূর্তে দেশের ভূগর্ভস্থ জলের ৮৭% ব্যবহৃত হয় কৃষিক্ষেত্রে এবং

২% শিল্পক্ষেত্রে। আর বাকি ১১% জল ব্যবহৃত হয় মানুষের প্রতিদিনের জীবনযাত্রার প্রয়োজনে। এই প্রেক্ষিতে যদি কৃষি উৎপাদনের বীজ, সার এবং সেচ ব্যবস্থার প্রয়োজনীয় সংস্কার সাধন না করা যায় সে ক্ষেত্রে ২০৫০ সালের মধ্যেই তীব্র জল সংকটের মুখোমুখি হবে এদেশের মানুষ। বিশ্বব্যাঙ্কের সংজ্ঞা অনুযায়ী মাথাপিছু বছরে ১০০০ কিউবিক মিটারের কম জল সরবরাহের মাত্রা পৌঁছলে তীব্র জল সংকটের তুল্য পরিস্থিতি বিবেচনা করা হয়। ২০২৫ সালে এ দেশে মাথাপিছু বাৎসরিক জলের যোগান ছিল ১৩৪১ কিউবিক মিটার যেটা আগামী ২০৫০ সালে কমে দাঁড়াতে পারে ১১৪০ কিউবিক মিটারে। অর্থাৎ স্বাধীনতার শতবর্ষ পূর্তিকালে শিয়রে সমন নিয়েই হাজির হবে জল সংকট এদেশের মাটিতে। পাশাপাশি জলবায়ুর উত্তরোত্তর নেতিবাচক পরিবর্তন ও বিশ্ব উষ্ণায়নের প্রভাব বিবেচনা করলে জল সংকট এদেশে আরো দ্রুত তীব্র আকার ধারণ করবে বলেই আশঙ্কা। ইতিমধ্যে দেশের চেন্নাই শহর জলশূন্য শহরের তকমা পেয়েছে। নীতি আয়োগের সমীক্ষা অনুযায়ী জলশূন্য হওয়ার পথে দেশের আরও ২১টি বড় শহর। এমন প্রেক্ষিতে নগর জীবনে উপযুক্ত পরিমাণ বিশুদ্ধ জলের যোগান বজায় রাখাই হয়ে উঠবে এই শতাব্দীর মধ্যভাগে অন্যতম প্রধান চ্যালেঞ্জ। সেই নিরিখেই এখন থেকে নলবাহিত জল পরিবহন প্রক্রিয়ায় জল নষ্টের পরিমাণ কমিয়ে আনার ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে। মনে রাখতে হবে বিশ্বে এমন নলবাহিত জল পরিবহনে জল নষ্টের পরিমাণ যেখানে ১৬-১৮% সেটাই এদেশে দ্বিগুণ। এই প্রেক্ষিতে বিপুল জনসংখ্যার দেশে যখন মিষ্টি জলের আধার সীমিত সেখানে জলের অপচয় কমিয়ে সঞ্চয় বৃদ্ধি ও জল পরিবহনের সুরক্ষায় বাড়তি গুরুত্ব আরোপ করা ছাড়া গতি নেই।

ভূগর্ভে লুকিয়ে বিপদ : পাশাপাশি ভূগর্ভস্থ জল উত্তোলনের ক্ষেত্রেও বিশেষ সতর্কতা প্রয়োজন। বিশেষত কৃষি থেকে শিল্পের প্রয়োজনে যে পরিমাণ ভূগর্ভস্থ জল উত্তোলন করা হয় সেই জল ভূগর্ভে ফিরে না গেলে যে শূন্যতা সৃষ্টি হয় তার থেকেও ঘটতে পারে ভূগর্ভস্থ জলে বিভিন্ন মাত্রার দূষণ। বিশেষত আর্সেনিক থেকে ফ্লুরাইড কিংবা নাইট্রেট দূষণ, ভূগর্ভস্থ জলে উত্তরোত্তর বিপদের ঝুঁকি বাড়িয়ে তুলছে। সম্প্রতি এক সমীক্ষায় প্রকাশিত যে এদেশের ভূগর্ভস্থ জলের উৎসের ৭০% দূষিত। দূষণের নিরিখে পৃথিবীর ১২২টি দেশের মধ্যে ভারতবর্ষের স্থান ১২০। যার মানে দাঁড়ায় ভারতবর্ষে ভূগর্ভস্থ জলদূষণের ঝুঁকি সর্বোচ্চ পর্যায়ে। এই প্রেক্ষিতে ভূগর্ভের জল নিষ্কাশনের ক্ষেত্রেও সরকারি নিয়ন্ত্রণ প্রয়োজন। এ দেশের পাঞ্জাব, হরিয়ানা, দিল্লি কিংবা তামিলনাড়ুর মতো রাজ্যগুলিতে ভূগর্ভের জল ব্যবহারের প্রবণতা সর্বোচ্চ। পাশাপাশি দেশের পশ্চিম ভারতের রাজস্থান কিংবা গুজরাটের বিভিন্ন অঞ্চল জুড়েও ভূগর্ভস্থ জল ব্যবহারের ঝুঁকি বাড়ছে। দক্ষিণ ভারতের কর্ণাটক, তামিলনাড়ু, তেলেঙ্গানা কিংবা মধ্যপ্রদেশের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে ভূগর্ভের জল ধারণের ক্ষমতা ভূপ্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যের কারণেই যথেষ্ট কম। আমাদের রাজ্যে জলের যোগানের পরিমাণ নিয়ে আশু সংকট না থাকলেও জলের গুণমান নিয়ে সমস্যা রয়েছে। ফলে এমন পরিস্থিতিতে সেই মাটির ভেতর থেকে জল টেনে বের করে শিল্প, কৃষি কিংবা দৈনন্দিন জীবনে লাগামছাড়া ব্যবহার করতে থাকলে শেষমেশ নলবাহিত জলেও দূষণের ঝুঁকি বাড়তে থাকে।

জল সঞ্চয়ের পরিকল্পনা : ভবিষ্যতের জল সংকট বিবেচনায় রেখে প্রয়োজন জলাভূমি থেকে খাল, বিল জলাশয় সংরক্ষণের সরকারি উদ্যোগ। ইতিমধ্যে দেশে সরকারি উদ্যোগে বড় বড় জলাশয় তৈরির পরিকল্পনা শুরু হয়েছে। এর পাশাপাশি দেশের শহরগুলিতে বৃষ্টির জল সংরক্ষণের পুর উদ্যোগ সীমিত পর্যায়ে চালু হয়েছে যেটার আরও বেশি প্রসার প্রয়োজন বৃহত্তর জল সংকট মোকাবিলার স্বার্থেই।

ফলে সার্বিক এই পরিস্থিতি বিবেচনায় রেখেই সরকারি স্তরে দেশে নলবাহিত জলের যোগান সুনিশ্চিত করার ক্ষেত্রে জলের গুণমানের প্রতি নজর দেওয়া বিশেষ প্রয়োজন। ইতিমধ্যে 'জল জীবন মিশনে'র মাধ্যমে গ্রাম থেকে শহরের বিভিন্ন পরিবারে নলবাহিত জলের সংযোগ সরকারি উদ্যোগেই কার্যকর হয়েছে। কার্যত দেশের ৮০ গ্রামীণ এলাকায় এমন জলের সংযোগ স্থাপিত হয়েছে। কিন্তু মনে রাখতে হবে নলের সংযোগ জলের প্রয়োজনে বাড়ি অবধি যেমন জরুরি তেমনি জরুরি সেই নল দিয়ে উপযুক্ত মানের পানীয় জলের পরিষেবা মানুষের বাড়ি অবধি পৌঁছানো। মনে রাখতে হবে জলবাহিত রোগে বছর বছর আক্রান্ত আবাল-বৃদ্ধ-বণিতাদের জীবন রক্ষার্থে সবার আগে চাই বিশুদ্ধ জল সরবরাহের সরকারি অঙ্গীকার। কারণ সেই পুরনো আপ্তবাক্য 'জলের অপর নাম জীবন' মেনেই চলছে জীবন চক্র।

উমা

লিমেরিটনিক

অনার্য মিত্র

১.
চাকরিহারার পরে এবার ভোটহারাদের দল,
ভোট কমিশন তাদের জন্য বানান আজব কল।
এসআইআর-এ ভোটার ছাঁটাই
কমিশনের হাতেই লাটাই
ভোট হারিয়ে দেশ হারিয়ে জাহান্নমে চল্।

২.
ভোট কমিশন একটি পুতুল, যায় না কেনা মেলায়
নড়াচড়া সব কিছু তার গুঁতোতে আর ঠেলায়।
কে দেয় ঠেলা, কে দেয় গুঁতো?
যার হাতে তার টিকির সুতো।
ভোট কমিশন তাই বনেছেন বিশ্বগুরুর চেলায়।

৩.
তিরিশ বছর ভোট দিয়ে আজ 'ঘুসপেটিয়া' হলাম,
আল্লা আমায় বাঁচায় না, তাই তোমায় জানাই সেলাম।
আমার ভিটে আমার মাটি
তাও যদি চাও করো চাঁটি
বাচ্চা-বিবি নিয়েই না হয় রইব তোমার গোলাম।

৪.
ভোট জিতলেই ভুগতে হবে স্মৃতিভ্রংশ রোগে,
মানুষ তখন পড়বেন আরও প্রচণ্ড দুর্ভোগে।
প্রতিশ্রুতি দিলেন যত
ভোটে জিতেই ভোলেন তত
ভোটার তখন নিত্যদিনই থাকবেন দুর্যোগে।

৫.
স্বাধীন দেশের ভোটে প্রথম পরাধীনের স্বাদ
ভোটাধিকার কেড়ে নেওয়ার পরম আহ্লাদ।
নাম পড়েছে কাটা
হাতে নিয়েছে ঝাঁটা
ঝেঁটিয়ে ভোটার বিদেয় করার এলেন সোনার চাঁদ।

৬.
ভোটের বুথে সিসিটিভি, কড়া নজরদার
এদিক থেকে ওদিক হলেই মট্‌কে দেবে ঘাড়।
ভয়ে কাঁপছি থরো থরো
আঙুল আমার জড়োসড়ো
বোতাম টিপি কেমন করে? - ভোটেরই বাহার!

৭.
হায়রে হায়রে হায়! এই বিচারের ধারা!
বিচারপতি বাছাই করেন জালি ভোটার কারা।
ভোটের দিন এগিয়ে এল
চৌতিরিশ লাখ বাতিল হল
তাদের মাথায় ঝুলছে আজও সন্দেহেরই খাঁড়া।

৮.
বুথে বুথে পাহারাতে আছেন অস্ত্রধর
প্রশাসনে দিকে দিকে বসিয়ে দিলেন চর,
চর নয় তো, অনুচর
গোয়েন্দা-তৎপর,
এ ভোটের কুশলী যিনি, জ্ঞানের ঈশ্বর।

উমা

অ্যানুয়াল স্টেটাস অফ এডুকেশন রিপোর্ট (এসার) ২০২৪-এর তথ্য অনুযায়ী সাড়ে ছ হাজার শিশুদের ওপর যে সমীক্ষা চালানো হয়েছিল তা থেকে জানা গেল ক্লাস থ্রি-এর ৭৬% পড়ুয়া ক্লাস টু-এর বই পড়তে পারছে না। ক্লাস ফাইভের ৫৫.২% ও ক্লাস এইটের ৩২.৫% পড়ুয়া ক্লাস টু-এর বই রিডিং পড়তে পারছে না। ক্লাস থ্রি ও ফাইভ-এর ৬৬% পড়ুয়া সাধারণ যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ করতে পারছে না। দেশের শিক্ষার মান কতটা নেমেছে তা আন্দাজ করা যায়।

তথ্যসূত্র : দি স্টেটসম্যান ০৯মার্চ ২০২৬

পাড়ায় পাড়ায় বিউটি পার্লার

যশোধরা রায়চৌধুরী

একজন নারী যখন সাজেন, পোশাক থেকে শুরু করে নানারকম অলংকার, গয়নাগাটি, ব্যাগ, জুতো, এখনকার ভাষায় অ্যাক্সেসরি দিয়ে সাজিয়ে তোলেন নিজেকে, এবং রূপটান, ক্রিম-পাউডার-মেকাপ ব্যবহার করে নিজেকে দুরুস্ত করেন, চুলের কেয়ারি ও কারুকাজে সাজান নিজেকে, এই প্রতিটি বিষয়ে অজস্র অর্থব্যয় করেন, তখন সেই ভীষণ সময়সাপেক্ষ, কঠিন কাজটাও কিন্তু একরকমের লেবার বা শ্রম বলে ভাবা চলে। কিছুটা শ্রম কেনা হয় স্যালোনে গিয়ে, বিউটি পার্লারে গিয়ে, হেয়ার স্পা বা চুল কাটার দোকানে। সেই সমস্ত শ্রমের যে প্রোডাক্ট বা ফল সেটা, অর্থাৎ এক সুসজ্জিত নারীদেহ, সেটা কিন্তু শেষ পর্যন্ত আসে না তার নিজের কোনো কাজেই। আমরা মনে করি, বা বিশ্বাস করতে পছন্দ করি, এই কাজের উপলক্ষ হল পুরুষের মনোরঞ্জন। অন্তত এমনটাই বলবে আমাদের দীর্ঘকাল ধরে লালিত পুরুষকেন্দ্রিক বিশ্বধারণা।

উদ্দিষ্ট যে ক্রেতা তথা ভোক্তা গোষ্ঠী, তা শুধুই পুরুষ যদি হয়ে থাকে, তাহলে এই গোটা ব্যাপারটাই নারীকে তার নিজের শরীরের থেকে বিচ্ছিন্ন করে তুলবে, তৈরি হবে অ্যালিয়েনেশন, নিজের শরীরের সঙ্গে নিজের। আর হ্যাঁ, এটাই বলেছেন বামপন্থী নারীবাদীরাও। আর সত্যিই সে কথাকে অবিশ্বাস করতে পারি না, যদি মিলিয়ে নিতে পারি নিজের অভিজ্ঞতার সঙ্গে।

কিন্তু সত্যিই কি তাই? সমাজ নামক অদৃশ্য চক্ষুময় একটি পৃথিবীর সামনে আসলে আসে এই সজ্জিত নারী শরীরটি। আর তাই, নরেন্দ্রনাথ মিত্র যেমন একটা চাকুরিরতা মেয়ের আগমনে সারা অফিসকে চক্ষুময় হয়ে উঠতে দেখেছিলেন, তেমনই অদৃশ্য ও দৃশ্য মেল গেজের সামনে মেয়েরা নড়েচড়ে, চুল ঠিক করে নেয়, ঠোঁটে রঙিন কাঠি বুলিয়ে নেয়।

পাশ্চাত্যে সোশিওলজি অফ দ্য বডি নামে একটি বিষয় আছে। মার্ক্স বলেছিলেন, শরীরও কীভাবে হয়ে উঠেছে প্রাতিষ্ঠানিক এক ক্ষেত্র, যার ওপরে নানা উৎপাদন প্রক্রিয়া মনোনিবেশ করেছে, তাকে বারবার বদলে দিতে চেয়েছে। (the body is not only the indirect and unintended result of social relations but the target object of a systematic processing)। এরপর আসরে অবতীর্ণ হন ফুকো সাহেব, তিনি বললেন, ক্ষমতার ক্ষেত্র এই শরীরও, এবং ক্ষমতাই তাকে সাজায়, তাকে পেশ করে সমাজে, বলে দেয়, কীভাবে দেখা হবে এই শরীরকে, কীভাবে তা আলাদা করে নেওয়া হবে অন্য শরীরের থেকে। এই সোশিওলজি অফ বডি বিষয়টি অতঃপর ঢুকে পড়ল বিদ্বজ্জনদের গণ্ডিতে, বইয়ের পর বই লেখা হল তা নিয়ে, আর, অতি সম্প্রতি এই বিষয় জন্ম দিয়েছে আর একটি নতুন বিষয়ের—যার নাম সোশিওলজি অফ কনজিউমারিজম!

নিজের চোখে দেখা শহর গ্রামের নিরিখে, বাংলার নিরিখে এইটা আমরা দেখতে পাই, কী দ্রুতই না পাল্টে গেল মেয়েদের নিজেকে সাজিয়ে তোলাটা, এই উদ্দিষ্ট ভোক্তা-র নিরিখে! একটা প্রজন্ম থেকে আর একটা প্রজন্মে, আলাদা আলাদা করে বলে দেওয়া যাবে না, মেয়েরা কার জন্য সাজেন। পুরুষের জন্য, নাকি নিজের জন্য?

এই নিয়ে চর্চা খুব একটা হয় না। হালে বেশ কিছু রিসার্চ হচ্ছে। বিজ্ঞাপনে মেয়েদের জন্য নিবেদিত প্রডাক্ট নিয়ে বিস্তৃত কাজ করেছেন যশোধরা গুপ্ত। পুরনো বিজ্ঞাপনের সঙ্গে যুক্ত করেছেন মেয়েদের এই আত্মসচেতনতার যাত্রাটাকে। তার আগে, মেয়েদের ফ্যাশন সেন্স বা রূপচর্চা নিয়ে অ্যাকাডেমিক বই খুঁজলে কি পাব? মেয়েদের চোখে মেয়েদের ফ্যাশন নিয়ে বই সম্ভবত বাংলায় নেই অন্তত যশোধরা গুপ্তের বিজ্ঞাপনের মেয়েরা বইটির আগে পিছে। যেমন নেই সৌন্দর্য বা রূপবিভার কনসিউমারিস্ট ট্রেন্ডের বিশ্লেষণধর্মী লেখা।

বহুদিন আগের কথায় পিছিয়ে যাই যদি, দেখব, আমাদের মেয়েদের জন্য, বিধান দেওয়া বা গাইডবুক রচনার কাজটি কবেই করতে শুরু করেছে বামাবোধিনী পত্রিকা। এই পত্রিকা প্রকাশ পায় ১৮৬৩ সালে। ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলার নারীদের শিক্ষা, সচেতনতা ও ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে প্রকাশিত প্রথম অন্যতম প্রধান মাসিক পত্রিকা। সদ্য উন্মেষ প্রাপ্ত বুর্জোয়া, মধ্যবিত্ত, সদ্য ইংরেজশিক্ষিত পুরুষ সমাজের জন্য

উপযুক্ত স্ত্রী/গৃহিণী/মাতা তৈরির জন্য এই পত্রিকা ছিল সদাসচেষ্ট। উমেশচন্দ্র দত্তের সম্পাদনায় এবং বামাবোধিনী সভার উদ্যোগে প্রকাশিত এই পত্রিকাটি নারীদের জন্য বিজ্ঞান, ইতিহাস, গার্হস্থ্য বিদ্যা ও সাহিত্য চর্চার সুযোগ তৈরি করে দিয়ে রক্ষণশীল সমাজে নারী শিক্ষা বিস্তারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল। তারই একটি লেখা এমন: "পরিবারের সকলে তাহার সৎদৃষ্টান্তে সাধু হইতে পারে। আমাদিগের দেশের প্রাচীন স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে গৃহিণীর গুণ যত দেখা যায়, এত আর কোন দেশে নয়। কিন্তু আজিকালিকার অনেক রমণী যেরূপ সুখবিলাসী হইয়া গৃহকর্ম্মে পরাঙ্মুখ হইতেছেন তাহাতে বড় সুলক্ষণ বোধ হয় না। ইংরাজদের স্ত্রীলোকদের যে এত সৌখিনতা তথাপি তাহাদের গৃহিণীর কার্য্য শিখিতে হয়। এক সুবিজ্ঞ সাহেব লিখিয়াছেন; বিনীত কুমারী, বিবেচক স্ত্রী এবং যত্নশীল গৃহিণী দ্বারা পরিবারের যে উপকার হয়, খোসপোসাকী ভোগবিলাসী আড়ম্বর প্রিয় অলস স্ত্রীগণ দ্বারা তাহার প্রত্যাশা করা যায় না। যে রমণী স্বামীকে পাপ পথ হইতে নিবারিত এবং সন্তানগণকে ধর্মপথে সুশিক্ষিত করিয়া সুখী করিতে পারেন, ইতিহাস ও উপন্যাস বর্ণিত বীরাঙ্গনাগণ অপেক্ষা তাঁহার মাহাত্ম্য অধিক।"

এর পর বিধান দেওয়া হচ্ছে : গৃহিণী অতি প্রত্যুষে শয্যা হইতে উঠিবেন। ইহাতে নিজের স্বাস্থ্যরক্ষা হইবে এবং সকল কার্য্য গুছাইবার সময় পাওয়া যাইবে। গৃহিণী যদি এক প্রহর বেলা পর্য্যন্ত নিদ্রা যান, পরিবারের অন্যান্য লোক দুই প্রহরে উঠিবে এবং প্রাতঃকালের কার্য্য সন্ধ্যাকালে সম্পন্ন হইবে। এরূপ গৃহে আলস্য, রোগ এবং দুঃখ চিরকাল বাস করে। কিছু যে গৃহে গৃহিণী রাত্রি প্রভাত হইতে না হইতে উঠেন, সে গৃহের সকল কার্য্য সুসময়ে সম্পন্ন হয় এবং সকল পরিবার সুস্থরূপে কর্তব্য কার্য্য সম্পন্ন করিয়া বিশ্রাম করিবার সময় অনেক পান।

গৃহ পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন রাখিবেন। প্রত্যুষে উঠিয়া যাঁহার দাস দাসী আছে তিনি তাহাদিগের দ্বারা গৃহ পরিষ্কার সম্পন্ন করিবেন, যাঁহার নাই নিজে করিবেন। স্নানাদি পরিচ্ছন্ন বসন পরিধান করিয়া যেমন আপনার শরীরকে প্রফুল্লিত করিবেন, তেমনি পরিবারের অপর সকলের প্রতিও দৃষ্টি রাখিবেন। গৃহিণী ম্লেচ্ছ রূপে থাকিতে ভালবাসিলে সে গৃহ লক্ষ্মীছাড়া হয়। এবিষয়ে অল্প অমনোযোগে অনেক অনিষ্ট হয় নিশ্চয় জানা আবশ্যক।

মিতব্যয়িতা গৃহিণীর একটী প্রধান ধর্ম। আমরা ব্যয় বিষয়ে যে নিয়ম কয়েক নির্দেশ করিয়াছি, গৃহিণীর তাহা স্মরণ রাখা আবশ্যক। তাহা না হইলে পদে পদে দুর্ভাগ্যের সম্ভাবনা। মহাপণ্ডিত জনসন বলেন "মিতব্যয়িতা বিজ্ঞতার কন মিতাচারিতার ভগিনী এবং স্বাধীনতার প্রসূতি। যিনি অপরিমিত ব্যয়শীলা, তিনি শী দুঃখে পড়েন, দুঃখ হইতে স্বাধীনতা নষ্ট হয়, স্বাধীনতা নষ্ট হইলে পাপ আপনা হই অধিকার করে।" আয় অধিক এবং ব্যয় অল্প হইলে কোনো ক্ষতি নাই, কিন্তু ব্যয় ছাপাইয়া গেলে ঋণগ্রস্ত এবং অশেষ দুঃখভাগী হইতে হয়।

—বামাবোধিনী পত্রিকা, শ্রাবণ ১২৭৭ "গৃহিণীর কর্তব্য"

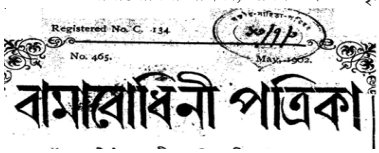

এ যেন সমৃদ্ধিশালী টাউনহাউজের বাসিন্দাদের জন্য প্রাচীন গ্রামীণ লক্ষ্মীর পাঁচালির পুনঃপ্রবর্তন।

যে যেমন করে সে তেমন পায়।/সে দোষে কর্মফল, করে হায় হায়।।/মহামায়ার স্বরূপে নারী সত্যবচন।/মর্ত্যবাসী না মানে এই কথন।।/সদাচার কুল শীল দিয়া বিসর্জন।/ঘরের লক্ষ্মীকে করে সদা বর্জন।।/এমন মনুষ্যজাতি মহাপাপ করে।/কর্ম দোষে লক্ষ্মী ত্যাজে তাহারে।।/নারীর পরম গতি স্বামী ভিন্ন কেবা।/ভুলেও না করে নারী পতি পদসেবা।।/যথায় স্বেচ্ছায় ঘুরিয়া বেড়ায়।/গুরুজনে নানা কটু বাক্য শোনায়।।/সর্বদা হিংসা করে না মানে আচার।/হিংসাতে তার মজে সংসার।।/ছড়া নাহি দেয়, প্রভাতকালে।/লক্ষ্মী সে স্থান ছাড়িয়া চলে।।/অতিথি যদি উপস্থিত হয় দ্বারে।/দূর দূর করি তারায় তাহারে।।/যেবা গুরু, ব্রাহ্মণ দেখি ভক্তি নাহি করে।/মম নিবাস কভু নহে সেই ঘরে।।/এঁয়োতির চিহ্ন সিঁদুর শাখা না দেয়।/বাসী কাপড়ে যথা তথা বেড়ায়।।/স্নান নিত্য নাহি করে যে মনুষ্য গণ।/ত্যাজিয়া তাহারে, করি অন্যত্র গমন।।/তিথি ভেদে যেবা নিষিদ্ধ দ্রব্য খায়।/হই না কভু তার ওপর সহায়।।/যে মনুষ্য ভক্তিভাবে, একাদশী না করে।/কদাপি নাহি থাকি তাহার ঘরে।।/উচ্চহাসি হাসিয়া যে নারী ঘোরে।/গুরুজন দেখি ঘোমটা না টানে।।/ বয়োজ্যেষ্ঠ দেখি যারা প্রনাম না করে।/সন্ধ্যাকালে ধূপ দীপ নাহি দেয় ঘরে।।/ঠাকুর দেবতা আদি কভু না পূজে।/সাধু সন্ন্যাসী দেখি হাসাাহসি করে।।/এমন নারী যে গৃহেতে বসতি রয়।/লক্ষ্মী ত্যাজে তাহাকে জানিবে নিশ্চয়।।

এ যেন এক নির্দেশিকা। নিয়মাবলী। যার সাথে গৃহের

যোগ আছে। নিজের জীবনযাপনের যোগ আছে। পাঁচালিও সে সময়ে মেয়েদের লাইফস্টাইল গুরু, আজকের দিনের প্রতিশব্দ ধার করে বলতে হয়। বেশ কিছু পুরনো লেখাতে, রূপ চর্চার কথা নেই, কিন্তু অবশ্যই ব্যক্তিগত সুস্থতার জন্য হাইজিনের কথা আছে। আজ যা বিউটি পার্লার, সে যুগে তা নাপিত বউ। আছেন আশাপূর্ণা দেবীর প্রথম প্রতিশ্রুতি-র নাপিত-বৌ, প্রথমবার সত্যবতীকে আনতে যাকে পাঠিয়েছিলেন এলোকেশী, যার সঙ্গে সত্যবতীকে পাঠান নি রামকালী আর সেই বিফল দৌত্যের খবর দিতে এসে সে জানিয়ে গিয়েছিল এলোকেশীর বৌমা বেশ বাচাল। দ্বিতীয়টি গল্প, সুচিত্রা ভট্টাচার্যের। দাগবসন্তী খেলা। আলতাবউয়ের গল্প। যাহোক, বিংশ শতকের শুরুর দিকের কিছু জীবিত কথন দেখে, পাচ্ছি মূলত মেয়েদের পরিচ্ছন্নতার বিবরণ। রূপচর্চার নয়।

প্রাচীন বাঙালি পরিবারগুলিতে মেয়েদের হাত পায়ের পরিচর্যা করতে নাপতিনি আসত। মায়েরা, সধবারা, গিন্নিবান্নিরা, স্বামীসোহাগে গর্বিতা হয়ে, সিঁথিতে সিঁদুর দিয়ে, লালা কস্তাপেড়ে শাড়ি পরে, পা এগিয়ে দিতেন। এখন বিউটি পার্লারে পেডিকিওর হয়। আমি নিজের চোখেই দেখেছি হুবহু সেই ঢঙে, পা দুটি কোলে নিয়ে নাপতিনি পায়ের নখ সূক্ষ্ম নরুন দিয়ে কেটে দিতেন, তারপর তরল আলতা কাঠির ডগায় তুলো দিয়ে বুলিয়ে পরিয়ে দিতেন। পদবন্ধটি রঙিন করতেন, পায়ের একটা বর্ডার তৈরি হত। লোকজন বলে আলতা হয় লাক্ষা থেকে আর তাতে এমন কিছু ভেষজ গুণ ছিল যা পা ফাটা রোধ করত। সারাদিন জল কাদায় কাজ করে, পদতলকে ক্ষয় লয় থেকে রক্ষা করা, এই ছিল মূল বিষয়।

চিত্রা দেব ঠাকুরবাড়ির অন্দরমহলে লিখেছেন ঠাকুরবাড়িতে নাপতিনি আসার কথা। কল্যাণী দত্তের 'পিঞ্জরে বসিয়া' বইতে সেকালের ভেতরবাড়ির জীবন্ত বর্ণনা আছে, যদিও নাপতিনির কথা আলাদা করে নেই। সদর দরজা সারাদিন খোলা থাকত, সেই কথা আছে। গেরস্তবাড়ির সদর উঠোন শুধু অতিথি কুটুম্বের জন্যে নয়, ফিরিওয়ালাদের জন্যেও খোলা থাকত। তাই সাড়া না দিয়েই আসত দুপুরে রেশমি চুড়িওয়ালী, পুরনো কাপড়ের বদলে জাপানি কাপডিশ, বাসনে নাম লেখাবেন ইত্যাদি। সন্ধে হলে আসত কুলপি বরফ আর বেলফুল। খাঁটি ঘি, ঘল্কি, পুরনো ধাইমা, বষ্টুমী এদের সবার ছিল অবারিত দ্বার। প্রতি শনি-মঙ্গলবার সন্ধেবেলায় আসত দাড়িওয়ালা 'মুস্কিল আসান'। তাঁর ঝাড়ন মাথায় বুলিয়ে সব রোগবালাই দূর করে দিত। পাঁচ পয়সায় সে আবার মৌলালীর দরগা থেকে জলপড়াও এনে দিত।

তাঁতী-বৌ আসত তার কাপড়ের গাঁটরি নিয়ে। বিকেল হলেই রাস্তার মোড়ে অবাক জলপান নকুলদানা নিয়ে ফেরিওয়ালা আসত একপায়ে ঘুঙুর বেঁধে। আলুকাবলি ঘুগনিওয়ালার মাথায় থাকত মস্ত ঝাঁপ — এক পয়সার আলুকাবলি আমরা জনা দুই-তিন মিলে চেটে চেটে খেতুম পাতায়। চিনির লিচুওয়ালা, বুড়ির চুল, এক পয়সার বায়স্কোপ, কাগজের ফুল বা বাঁশিওয়ালা—এদের জন্যে কত ছেলেমেয়ে যে পুজোর ঘরের জলচৌকি থেকে পয়সা চুরি করত! একান্নবর্তী কলকাতার গেরস্থালীর কথা কি যে বলি আর না বলি। দিদির শাশুড়ি বলতেন—'কথা কইতে জানলে হয়/কথা শতধারে বয়।'

এইসব ফেরিওয়ালা দলের সাথে সাথেই রূপচর্চার জন্য নাপতিনিরা আসতেন নিঃসন্দেহে।

'পিঞ্জরে বসিয়া'-তে বেসিক হাইজিনের কথাও আছে।

"গিন্নিরা কি শীত কি গ্রীষ্ম, রাত চারটেয় উঠে চৌবাচ্চার বাসি জলে স্নান সেরে রান্নাঘরে আসতেন। তখন ভোর পাঁচটা বাজত, বেরোতেন আন্দাজ দুটো। তারপর ঠাকুরঘরের পালা সাঙ্গ করে বেলা আড়াইটে-তিনটের আগে তাঁদের ভাত খাওয়া ঘটত না। আমাদের পাড়ার কোনো এক বাড়ির নাইবার ঘরে সত্যি সত্যি পার্কো (পাতকুয়ো) দেখেছি—মুখে তার মস্ত পাথরচাপা। শুনতুম বেহ্মদত্তিরা সেই পাথরটা মধ্যে মধ্যে তোলার নাকি চেষ্টা করত! ওদিকে উঠোনে ভোর থেকে ছর্-ছর্ করে জল পড়ত কল থেকে, পাশেই মস্ত চৌবাচ্চা—তার পাড়ে সারি সারি কলাইয়ের বাটিতে কর্তাদের নিম বা পেয়ারা দাঁতন কিংবা অষ্টবজ্র মাজন। পরে এলো 'কলিনোস' টুথপেস্ট। মেয়েরা ব্যবহার করতেন তামাকের গুল বা ঘুঁটের ছাই। চোটদের দল বাঁ হাতে তেল-নুন কিম্বা খড়ি ফিটকিরি নিয়ে হেলেদুলে বহুক্ষণ ধরে দাঁত মাজতো।"

দাঁত মাজার বিস্তারিত বিবরণ পাচ্ছি অনুপমা ঝা-এর মৈথিল-গৃহবধূর আত্মকথা-তে। "দাঁত মাজার জন্য আমাদের দেশে সবাই ভেরান্ডার ডাল ভেঙ্গে ব্যবহার করা হত। ভেরান্ডার ডাল ভাঙ্গলে সাদা আঠার মত বের হত। আঠা সমেত সেই ডাল ব্যবহার হত। নিমের ডাল, কচি পেয়ারা পাতা, কাঠ কয়লা দিয়েও দাঁত মাজা হত। এখন অনেকের দাঁতে ব্যথা, পোকা ধরা দেখি। পেয়ারা পাতা জলে সিদ্ধ

করে সেই জলে দাঁত ধুলে বা কচি পেয়ারা পাতা ভাঁজ করে দাঁতে ঘষলে খুব উপকার। আমি এখনও ব্রাস-পেস্ট কম ব্যবহার করি। আমি কখনও দাঁতের ডাক্তারের কাছে যাই নি"।

এই বইতেই পাচ্ছি কাপড় কাচার বৃত্তান্তও। বাড়ির রিঠা গাছের থেকে রিঠা ফল পড়ত। সেই ফল কুড়িয়ে, জলে ভিজিয়ে সেই জলে চুল ধোয়া হত। কাপড় কাচাও হত। শুকনো কলাপাতা পুড়িয়ে তৈরি করা হত ছাই, যা নাকি ক্ষার। ক্ষার কাটার পর্ব আমাদের শৈশব অব্দি দেখেছি।

রূপটানের অনেক বৃত্তান্ত শুনেছি আর দেখেছি তখনো। সব বাড়িতেই থাকত সর বাটা, সরের সঙ্গে বেসনের গুঁড়ো মিশিয়ে মুখে মাখার ব্যবস্থা। মুসুরির ডাল বেটে ফর্সা হয়ে উঠতে আমি নিজে চোখে মেয়েদের দেখেছি। দেখেছি চন্দন নিম ইত্যাদির প্রচুর ব্যবহার। আমাদের শৈশবে আমার মায়েদের প্রজন্ম, যাদের জন্ম স্বাধীনতার আগে কিন্তু বেড়ে ওঠা স্বাধীন ভারতের প্রথম দিনগুলিতে, তাঁদের বিয়েতে আসা শুরু হল কাঠের "আধুনিক" ড্রেসিং টেবিল।

সেই ড্রেসিং টেবিলে স্থান পেতে শুরু করল তখন বসন্ত মালতী ময়েশ্চারাইজারের বোতল, কিউটিকুরা পাউডার, সরু গলার চমৎকার দেখতে নব্য ময়েশ্চারাইজার তুহিনার বোতল। তার আগে পরে বাজারে এসেছে আরো অনেক নতুন প্রডাক্ট। বিশেষ করে রূপচর্চার, বিদেশি ইম্পোর্টেড প্রডাক্টকে পাল্লা দিচ্ছে দিশি ব্র্যান্ডেরা। তখনো আলতা সিঁদুর আসে ঘরে ঘরে থরে থরে। কিন্তু পাশাপাশি দেখা যায় কান্তা সেন্ট। কুন্তলীন আরো আগের, এক প্রজন্ম পুরনো। কিন্তু আমাদের শৈশবে মাথার তেল বলতে ছিল কেয়ো কার্পিন। আর বিশুদ্ধ নারকেল তেল। তেল দিয়ে চুল জবজবে করে সন্ধেবেলা বেঁধে দিত মায়েরা, পড়তে বসার আগে। মাথা ঠাণ্ডা থাকলে পড়াশোনাও ভাল হবে।

লীলা মজুমদারের ১৯৬৩ সালে লেখা চীনে লণ্ঠনে হাই সোসাইটির এক বৃদ্ধা/প্রৌঢ়ার এই বর্ণনা এইরকম।

"রাঙাদিদিমণিও এলেন; কালের গতির সঙ্গে পাল্লা দিচ্ছেন তিনি, কোনো কিছু থেকে বাদ পড়তে চান না। কী রূপ রাঙাদিদিমণির; বিরাশি বছর বয়স, তবুও রূপ আর ধরে না। তিরের মতো সোজা দেহ, বিদ্যুতের মতো দৃষ্টি। মিনা মাসিমার মা। এত বয়সেও শখের আর অন্ত নেই। বসন্তকালে দার্জিলিং-এ যে আইরিশ ফুল ফোটে, সেই রকম লঘু, সেই রকম শুভ্র, একটুখানি বাতাসের দোলা লাগলে সেই রকম দুলে ওঠেন।"

বাণী রায়ের বিখ্যাত উপন্যাস "প্রেম"। সেখানে নায়িকা রুপালির সাজ বার বার বর্ণনা করেছেন বাণী। ঘন ঘন ডাইরি লেখা, ইংরেজি সাহিত্যে দীক্ষিতা বালিকা রুপালি বলে, 'মাধুরীদির মাকে দেখে প্রথমে আমি তাঁকে বাড়ির ঝি মনে করেছিলাম ... মাধুরীদি নিজে বোধ হয় রান্না করেন, হাতে তাঁর হলুদের দাগ।" রুপালি সতেরো বছরের জন্মদিনে "জরিপাড় নীলাম্বর পরে, বেণীতে জড়ান তার আধফোটা বেলকুঁড়ির মালা"। কলকাতার সম্ভ্রান্ত ও অভিজাত, এলিটিস্ট বর্ণনার ছোট ছোট কাজে বাণী রায় একটা সময়কে ধরেন।

ঠিক বিপরীতে কবিতা সিংহ তাঁর ১৯৫৬ সালে লিখিত চারজন রাগি যুবতী উপন্যাসে দেখান সেইসব মেয়েদের যারা ঝলমলে এবং গায়ে সঠিক মাপে না বসা, ঢিলে, কিছুটা হিপিসুলভ কাপড় পরে। চারটি সতেরো আঠেরো বছর বয়সের মেয়ের চোখ দিয়ে দেখানো কলকাতা, নতুন করে ষাট সত্তর দশকের উঠে আসা বিপণন ধর্মী, উপভোক্তা ভোলানো লাবণ্য রং ঢং, পার্ক স্ট্রিটের বড়োদিনের আলো থেকে অভিজাত রেস্তোরাঁর নরম গালিচার মোহ। পোশাকের বর্ণনা, নেল পালিশ আর নানা রকম চুল বাঁধার কথা তার ভেতরেই আসে।

"আমি বেট ফেলে বলতে পারি, সীতাকে আপনাদের ভালো লাগবে না। সীতাটার সবই আছে। কিন্তু কেমন যেন আলুনি আলুনি। আর জানেন শুধু সুন্দর বলেই নয় সুমনকে আমরা সবাই ভালোবাসি, ও খুব রঙিন বলে। খুব খামখেয়ালি বলেও।

সুমনের পরনে একটা বাঁধনীর কাজ করা লুঙ্গি সেট। জয়পুরী বাঁধনী। ওর মা দিল্লী থেকে পাঠিয়েছেন। সবুজ কমলা আর কালোর তেরছা স্ট্রাইপ। স্ট্রাইপগুলো স্পষ্ট নয়। বাটিকের কাজের মত আবছা আবছা। সুমন যখন হাঁটছে, ওর বুক, সরু কোমর, গায়ের লম্বা সুঠাম গঠনগুলো একবার করে দারুণ স্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে, আবার ঢেকে যাচ্ছে। আর সেইজন্য ওর এই পলকে হারানো আর পলতে ফিরে পাওয়া শরীর দেখবার জন্য, আপনারা সুমনের দিকে একটু বেশি দেখছেন। তাই না? (চারজন রাগি যুবতি, কবিতা সিংহ)

কিন্তু পালটে আসছিল সবটাই। সত্তরের দশকের থেকে আশির দশকে আসতে আসতে মেয়েদের ববি লক্স আর ববি প্রিন্টের জামার আয়েশ চেপে বসছিল নতুন করে, বড় বড় রিং দুল পরা মেয়েদের ইশকুলে ওসব পরে যাওয়া মানা

হচ্ছিল। ফ্রক আর চাপা স্ল্যাক্স, এ লাইন জামা, এসব আসছিল।

পশ্চিমঘেঁষা পোশাকের প্রতি মূলধারার ঈষৎ পক্ষপাতদুষ্ট তির্যক দৃষ্টিটা থেকেই যাচ্ছিল তাই। ফ্যাশনদুরস্ত হওয়াটা খুব হাতে গোনা কয়েকজনের সাহসী পদক্ষেপের ব্যাপার। অথবা বাবার মোটা ব্যাঙ্ক ব্যালান্সের সঙ্গে সমার্থক। যেমন সিনেমায় প্রতিফলিত অপর্ণা সেনের পার্সোনা, রাতের রজনীগন্ধা অথবা বসন্ত বিলাপের প্যান্ট-টপ পরিহিতা স্মার্ট লুক, তখনো আপামর বাঙালির ভুরু তুলে দেখার উপযোগী এক সাময়িক বিলাসিতা... আমি মিস ক্যালকাটা নাইনটিন সেভেন্টি সিক্স-এর চটুলতায় শেষমেশ পর্যবসিত।

নব্বই-এর আশেপাশেই উদার অর্থনীতির হাত ধরে আমাদের সংস্কৃতিতেও এসে ঢুকেছে ফ্যাশনের বন্যা।

ফ্যাশন দুষ্প্রাপ্যতা ঘোচাল ঘরে ঘরে সমাগত টিভি। দূরদর্শন ৭০ দশক থেকে ২০১১ অব্দি বাঙালি মেয়েদের রুচি-ফ্যাশনের হালহকিকত পাল্টাতে অনুঘটকের কাজ করেছে। তারপর এসে গেছে ৯০-এর উদার অর্থনীতির হাত ধরে ৭২ চ্যানেলের কেবল টিভি আর বে ওয়াচ। ২০০৫-০৬। আমাদের বাড়ির কাজের মেয়ে কাজের ফাঁকে ফ্যাশন শো দেখে।

এ সময়ের সানন্দার রূপটানের সংখ্যাগুলিকে যদি বলি বাঙালি মেয়েদের বিউটি ও গ্ল্যামার পথের প্রথম পাঠ, খুব ভুল হবে না।

সেই দশকের থেকে তুলে আনা একটি বিজ্ঞাপন, যা সানন্দা পত্রিকার কোনো সংখ্যার টিজার ছিল, এই প্রকার: "রূপসির রাতের রূপরুটিন। এই সংখ্যায় প্রচ্ছকাহিনি। বারোজন সুন্দরী। সারাদিন তাঁরা রূপসি। এই রূপের আসল জাদু লুকোনো থাকে তাঁদের রাতে। শোবার আগে গোপন রূপপচর্চায়।

সেসব কথা আজও কেউ জানতে পারেনি। শুধু ('আমাদের কাগজ')-কেই ওঁরা জানালেন।

নাভিতে গরম ঘি লাগিয়ে শুই, চোখের দৃষ্টি উজ্জ্বল করার জন্য। সারা শরীরে অলিভ অয়েল ম্যাসাজ করি। শুধু সুতির একটা লম্বা টি-শার্ট পরে শুতে যাই। শুধু নারকেল তেল সারা শরীরে ম্যাসাজ করি। স্লিভলেস নাইটি পরে শুতে যাই। ঢিলেঢালা সুতির রাতপোশাক পরি। রাতে টান করে চুল বাঁধি না। বায়োটিক-এর বডি ম্যাসাজ দিয়ে সারা শরীর ম্যাসাজ করি। শোবার আগে মুখে গলায় নারকোল তেল মাখি। তারপর মুছে ফেলি ভিজে তোয়ালে দিয়ে ইত্যাদি ইত্যাদি।"

বাংলার মধ্যবিত্তেরা আশির দশক থেকে আমেরিকা থেকে আমদানি হওয়া নারীবাদ ও বিউটি ম্যাগাজিন, দুইই পেয়েছে। মধ্যবিত্তের পাড়ায় পাড়ায় বিউটি পার্লার এসেছে।

নব্বই দশকেই উঠে এসেছে মনমোহন ইকনমিক্স, ফেটেছে লিবারালাইজড অর্থনীতির ধামাকা। মেয়েরা কীভাবে জড়িত এই ঘটনার সঙ্গে? কেউ এ প্রশ্ন আর জিগ্যেস করবেন না, কারণ সবারই মনে আছে, ১৯৯৪-তে অবাক করা সেই বাঙালি মেয়েটিকে---সুস্মিতা সেন। মিস ইউনিভার্সের শিরোপা নিয়ে যে নিজেই কম অবাক হয় নি। আসল খেলাটার যোগাযোগ আরও স্পষ্ট হল আরও কয়েকদিন পরে, সেই ১৯৯৪-তেই মিস ওয়ার্ল্ডের শিরোপাও যখন জুটল আমাদের দেশের মেয়ে ঐশ্বর্য রাইয়ের কপালে। কাকতালীয়? না, এশিয়ার অন্যতম বাজারের দরজা পাশ্চাত্যের যাবতীয় প্রসাধন সামগ্রীর বিক্রেতাদের কাছে খুলে যাওয়া? ঘরের মেয়েটির পদাঙ্ক অনুসরণ এর পর শুধু। একের পর এক বিউটি পেজেন্টে নেমে আসছে ভারতীয় মেয়েরা, বাঙালি মেয়েদের জীবনে ধ্রুবসত্য হয়ে উঠেছে রেভলন-মেবিলাইন-এল-এইটিনের মতো সব ম্যাজিক শব্দ ... ডিপ রাস্ট, কফি ব্রাউন আর লাইট অ্যাম্বারের মতো সব দূরদূরান্তের হাতছানি ভরা রঙের শেড ... মন কেমন করা গন্ধ পারফিউম আর সাবানের... ভারতীয় অর্থনীতির উদারীকরণ, আহা, মেয়েদের কাছে খুলে দিল নানা পশরার দ্বার। ল্যাকমে চালু করেছে মেয়েদের ত্বকের শেড কার্ড। যেভাবে এশিয়ান পেন্টস চালু করেছে অন্য শেড কার্ড, দেওয়ালের রঙের।

বিউটি ও ওয়েলনেস ইন্ডাস্ট্রি এখন একটি চাবিশব্দ, ভারতের অর্থনীতির সার্ভিস সেক্টরের অন্যতম এক অংশ। প্রায় কোনো সন্দেহ নেই তাতে। যদি ২০২০ পরবর্তী ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে ওঠা জিমগুলি দেখি বুঝব ওয়েলনেস মাদকতা পুরুষ নারী নির্বিশেষে ছড়িয়েছে। কিন্তু তার আগে যা ছিল তা মূলত ওই পাড়ায় পাড়ায় বিউটি পার্লারগুলোই।

২০০০ পরবর্তীতে আমরা বারেবারেই পাচ্ছি নানা নতুন তথ্য, যা দেখিয়ে দেয়, শহর থেকে গ্রামের দিকে দুর্দমভাবে গতিশীল এই প্রবণতা। বিউটিপার্লারে সাজার ইচ্ছা ও সাধ্যের মধ্যে তাকে পাওয়ার প্রেরণা বিপরীতে অনেক বিউটিসিয়ান কোর্স করা মেয়ের চাহিদা তৈরি করবে। আর সেখান থেকেই

তৈরি হবে ভোকেশনাল ট্রেনিং-এর নানা নতুন দিক। হাতেকলমে শিক্ষায় একটি বিশেষ ধারা হবে কসমেটোলজি। এর ভেতরে দুটি ধারা, একটি বিউটিশিয়ান অন্যটি হেয়ার ড্রেসিং। এছাড়া ফ্যাশন ডিজাইনিং, টেলারিং ইত্যাদি ফ্যাশন আনুষঙ্গিক ক্ষেত্রে এ ধরনের হাতেকলমে কাজ শেখার দাবি ও আর্জি ক্রমশ বেড়েছে মেয়েদের মধ্যে।

আমরা দেখেছি, তরুণ তরুণীদের উচ্চশিক্ষা বেছে নেওয়ার পাশাপাশি কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার উভয়তই বিশেষভাবে চেষ্টাশীল কার্যকরী বা ভোকেশনাল ট্রেনিং দেওয়া, বা স্কিল ডেভেলপমেন্ট (কারিগরি শিক্ষা/পটুত্ব অর্জন)-এর জন্য নানা ধরনের কোর্স মডিউল তৈরির। পঞ্চায়েতি রাজ দপ্তরের অধীনে, নগরোন্নয়ন দপ্তরের অধীনে নানা ধরনের প্রশিক্ষণ কর্মসূচি নিত্য চলেছে। একদিকে কেন্দ্রীয় মন্ত্রক, স্কিল ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড এন্টারপ্রেনিয়রশিপের (হিন্দিতে কৌশল বিকাশ এবং উদ্যমিতা মন্ত্রক) অধীনে, পশ্চিমবঙ্গেই আছে ন্যাশনাল স্কিল ট্রেনিং ইনস্টিটিউট। তার ওয়েবসাইটে গেলেই দেখা যাবে কসমেটোলজির কোর্সে নানা বেসরকারি সংস্থার সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধেছেন তাঁরা। সেই সংস্থাগুলির উদাহরণ ওয়েবসাইটেই পাওয়া যাচ্ছে। নামগুলি গোপনীয়তার খাতিরে বলছি না, কিন্তু সে তালিকায় আছে নানা ধরনের বিউটি, ওয়েলনেস ও স্পা সার্ভিস, চোট থেকে বড় পার্লার। কলকাতা বা হাওড়াস্থিত শুধু নয় উত্তরপ্রদেশের বারাণসী থেকে কানপুর, নানা স্থানের বিভিন্ন সংস্থা, প্রতিটিই বেসরকারি, এই ট্রেনিংগুলি দেওয়ার ব্যাপারে সরকারের সঙ্গে যুক্ত। অন্যদিকে Department of Technical Education, Training and Skill Development, Government of West Bengal -এর ওয়েবসাইট বলে দিচ্ছে, ২০২৫-এর উৎকর্ষ বাংলা এক্সেলেন্স অ্যাওয়ার্ডের তালিকাতেও কুকারি, বেকারি ইত্যাদি অন্যান্য বিভাগের সাথে সাথে দুজন মেয়ে পুরস্কৃত হয়েছেন নিম্ন মধ্যবিত্ত পটভূমি থেকে উঠে এসে রূপচর্চা ও কেশবিন্যাসের কোর্স আই টি আই কলকাতা থেকে করে সাফল্য দেখিয়ে। পুরুষদের ক্ষেত্রে এই প্রশিক্ষণ ও দক্ষতার বিষয়ের ক্ষেত্রগুলো গাড়ির বডি সারাই, ছুতোরের কাজ, সাইবার সিকিউরিটি পর্যন্ত বিস্তৃত।

আই টি আই বা ইন্ডাস্ট্রিয়াল ট্রেনিং ইনস্টিটিউটের কলকাতাস্থ ক্যাম্পাসে এসে ট্রেনিং নিতে পারেন দশ ক্লাস পাশ করা ছেলেমেয়েরা। কলকাতা ছাড়াও চোপরা পুরুলিয়া ছাতনা কৃষ্ণনগর আসানসোল তুফানগঞ্জ আলিপুরদুয়ারে শাখা হিসেবে কাজ করছে আই টি আই। ডিরেক্টরেট অফ ইন্ডাস্ট্রিয়াল ট্রেনিং-এর অধীনে আই টি আই-তে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় কী কী বিষয়ে, একটু দেখা যাক। ৭০টি ট্রেড (সি টি এস বা ক্রাফটসম্যান ট্রেনিং স্কিম)। ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যাসিস্টান্ট, ডেস্কটপ পাবলিশিং অপারেটর, কম্পিউটার এডেড ডিজাইন অ্যান্ড ড্রইং-এর মতন কার্যক্রমের পাশাপাশি এখানে এক বা দুবছরের অনেক কার্যক্রম পাচ্ছি। তার মধ্যে কসমেটোলজি রয়েছে স্বমহিমায়। মেয়েদের জন্য পোশাক তৈরি বেকারি কনফেকশনারির মতো ট্রেনিং-ও অবশ্যই কিছু কম জনপ্রিয় হবে না।

গ্রামগঞ্জ থেকে মেয়েরা কি কেবল শহরস্থিত আই টি আই-তেই আসছেন এই প্রশিক্ষণ নিতে? না, পশ্চিমবঙ্গের প্রতি জেলা সদরে আছে জেলা শিল্প কেন্দ্র। যেখানে সরকারি কর্মীরা জেনারেল ম্যানেজার হিসেবে স্কিল ডেভেলপমেন্টের জন্য কাজ করেন।

জাতীয় স্তরে দীনদয়াল অন্ত্যোদয় যোজনা, জাতীয় গ্রামীণ জীবিকা মিশনের অধীনে গ্রাম এলাকায় আর শহরের জীবিকা মিশনের অধীনে শহর এলাকায় সেলফ হেল্প গ্রুপের আকারে মেয়েদের ছোট দলগুলি কিন্তু বিউটি পার্লার তৈরি করার জন্য সরকারের পূর্ণ সহায়তা পান।

এটা পড়ে "নন ফার্ম লাইভলিহুড ইন্টারভেনশন"-এর অধীনে এবং রাতমতো অন্য যে কোনো ক্ষুদ্র শিল্পের মতোই এ কাজেও ব্যাঙ্ক থেকে লোন পাওয়ার অধিকার বা অন্যান্য ক্ষমতা হাতে আসে, অন্যদিকে দায়িত্বও বাড়ে নিয়মিত হিসাবরক্ষা আর অন্যান্য নিয়মকানুনের বেড়াজাল মেনে কাজগুলো করার। বিউটি পার্লার এখন জাতীয় স্তরের, এম এস এম ই বা ক্ষুদ্র, লঘু ও মাঝারি উদ্যোগের তালিকায় ৯৬০২০ নং একটি অনুমোদিত উদ্যোগই শুধু নয়, একটি ছোটখাটো বিউটি পার্লার স্থাপনের খরচ যে আনুমানিক তিন লাখ টাকা, সেকথাও জানান দিচ্ছে কেন্দ্রীয় এম এস এম ই পোর্টাল। যেখানে ধরা হচ্ছে বিউটিশিয়ানের মাসিক মাইনে ৭০০০ এবং হেল্পারের ৩০০০।

বাস্তব কি এই সরকারি গ্রন্থিত 'স্বপ্নের' ধারপাশ দিয়ে যাচ্ছে? গ্রামে গঞ্জের বিউটি পার্লারদের অস্তিত্ব আমরা জানি, সামান্য ঘোরাঘুরি করলেই দেখা যায় স্বচক্ষে। কিন্তু, নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক সরকারি আধিকারিকের কথায়, তাঁরা জেলা স্তরের শিল্পকেন্দ্রে নিজেরাই টেলারিং বা ফ্যাশন

ডিজাইনিং-এর পাশাপাশি, বিউটিশিয়ান কোর্সের বন্দোবস্ত করেছেন একদা, সব ঠিক। কিন্তু, দুটো সমস্যার তাঁরা মুখোমুখি হয়েছিলেন। এক, বিউটিশিয়ান কোর্সে ভর্তি হতে চাওয়া মেয়েরা সবাই যে পরবর্তীতে বিউটি পার্লার খুলবেন বা নিজে সেখানে কাজ করে নিজের পায়ে দাঁড়াবার বন্দোবস্ত করবেন তা কিন্তু নয়, প্রশিক্ষণের কিছু দিন পরে যে সরকারি অ্যাসেসমেন্ট হয় সেখানে দেখা গেছে, কিছু মেয়ে আসলে শিখছিলেন নিজে সাজবেন বলে। এ সূত্রে মনে পড়ে গ্রামবৃদ্ধসুলভ আমাদের সামাজিক মাধ্যমের হায় হায় গেল গেল-র নতুন এক অভিমুখ, রিল বানানো সেইসব গ্রামীণ মেয়েদের নিয়ে, যারা নকল আইল্যাশ লাগিয়ে, চমৎকার সেজে, গ্রামের বাড়িতে গরুর দুধ দোয়ার রিল বানিয়ে উপার্জন করেন। সত্যি বলতে কি, সারা ভারতের চিত্রটা নিশ্চিত খুব আলাদা নয়, নাহলে শ্রদ্ধেয় কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীকে দেখা যেত না বাজেটে রিল বানানো জাতীয় ডিজিটাল কনটেন্ট মেকিং-কেও একটা উৎসাহ দেবার মতো প্রশিক্ষণ তালিকাভুক্ত করতে! অন্য যে ভয়টা উক্ত সরকারি আধিকারিক জানান সেটা আরো দুশ্চিন্তার। দলাইমলাই বা মাসাজ দেওয়া শেখার পর যে মেয়েরা বিউটি পার্লারে বা মাসাজ পার্লারে চাকরি পান, তাঁদের ভবিষ্যৎ নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন থেকে যায় এবং উক্ত ট্রেনিং-এর পর যে তাদের কোনোভাবে যৌন পরিষেবায় যৌনকর্মী হিসেবে অ্যাবিউজ বা অপব্যবহার করা হবে না তার গ্যারান্টি কে দেবে। অবৈধভাবে অনেক মাসাজ পার্লার গোপনে মধুচক্র হিসেবে কাজ করে। বিশ্বের তা-বড় নেতানেত্রী, প্রশাসনিক আধিকারিক থেকে সাম্রাজ্যের অধীশ্বর, রাজপুরুষদের 'মাসাজ' নেওয়া তথা তরুণীদের যৌন নিগ্রহের কাহিনিতে যেখানে আজকের নিউজ মিডিয়া রীতিমতো আবিল ও আপ্লুত (এপস্টিন ফাইল বিশ্বের বৃহত্তম স্ক্যান্ডালে রূপান্তরিত আজ), সেখানে ভারতে তথা বাংলার নিবিড়তম কোণে কী কী ঘটে মেয়েদের নিয়ে তা আমাদের অবিদিত নয়, আশঙ্কার তাই জায়গা আছে।

প্রতি রাজ্যেই এই ধরনের সংস্থা কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে তৈরি হয়েছে নিঃসন্দেহে। শহর ও শহরতলি এলাকায়, বিশেষভাবে এই ধরনের পটুত্ব অর্জনের কোর্সে ঢুকে পড়ছে বিউটি পার্লারের কোর্স। সম্প্রতি একটা আলোচনা সভায় উঠে আসে এ কথা যে, সরকার থেকে ভোকেশনাল ট্রেনিং-এর ব্যবস্থা করানোর প্রস্তাব এলে, এমনকি গ্রামের মেয়েরাও, কী ধরনের ট্রেনিং তারা চায়, জানতে চাইলে, বিউটি পার্লার ট্রেনিং-এর জন্য দাবি জানায়। শুনে বিজ্ঞজনেরা ঠোঁট বাঁকালেও এটা ভুল আমাদের। এই পেশাকে ছোট করে দেখা যাবে না আর, তাছাড়া এতে করে সত্যিই মেয়েদের চাকরি পাওয়ার সম্ভাবনা বাড়ে।

অন্তর্জালের এক রিপোর্ট বলছে, আপাতত বিউটি ও ওয়েলনেস সেক্টর যদিও অসংগঠিত শ্রমক্ষেত্র এবং গ্রামেগঞ্জের তথ্য সচরাচর পাওয়া সমস্যা, তথাপি সংগঠিত ক্ষেত্রের কর্মীর সংখ্যাটা ১ কোটি ২০ লক্ষ। ২০২৭ সালের মধ্যে সংখ্যাটা দু কোটিতে পৌঁছবার সম্ভাবনা আছে। এখানে লক্ষ্য করব, এর মধ্যে পঞ্চাশ শতাংশের বেশি কর্মীই কিন্তু মেয়েরা। অতএব, ব্যাপারটা আর লঘু করে দেখার নয় কোনো মতেই। অন্য কোনো পেশাতেই এত বেশি মেয়েদের প্রয়োজন হয় না, এবং গাঁ গঞ্জ অব্দি ছড়িয়ে যাওয়া বিউটি পার্লার ও বিউটি প্রডাক্টের চাহিদাই বলে দেয়, এ ব্যবসা লাভজনক হতে বাধ্য। অবশ্যই বিপদের হাঁ-মুখ এদিকে ওদিকে দেখা যায়। কিন্তু এই পর্যায়ে দাঁড়িয়ে আমরা একদিকে দেখছি গিগ অর্থনীতিতেও বিউটি পার্লারের ব্যবসা রীতিমতো স্বীকৃত মান্য এক স্থান নিয়েছে। ২০২০ সালের পর থেকে কী পুরুষ কী মেয়ে সবার জন্য ঘরে ঘরে নানা রকমের বিউটি থেরাপির উপাদান ও সরঞ্জাম নিয়ে, গামলা থেকে ছোট মালিশের খাট ইত্যাদি নিয়ে পেডিকিয়োর থেকে কেশবিন্যাসে পৌঁছে যাচ্ছেন আরবান কোম্পানি জাতীয় বিভিন্ন কোম্পানির পুরুষ ও নারীরা। খুচরো ব্যবসার নতুন আরেক দিক খুলেছে গিগ ইকনমি। তার পেশল হাতের শোষণের খবর আমরা পাচ্ছি এ কথা যেমন ঠিক, অনিবার্যভাবে যে ব্যক্তি বিউটি পার্লারে নিজে গিয়ে রূপচর্চা করাতেন না তার ঘরে পৌঁছে যাচ্ছেন কর্মী বা কর্মিণী। দুয়ারে পেডিকিওর ম্যানিকিওর। যা এখন আর ঠিক নেই রূপচর্চা বা পার্সোনাল হাইজিন বা স্বাস্থ্যের জন্য জরুরি এক চর্চা হয়ে উঠছে। উল্টোদিকে, এই কালো টি শার্ট পরিহিতারা আবার ফিরিয়ে আনছেন ঘরে ঘরে গিয়ে হাতে পায়ের নখ কেটে পায়ের তলায় বীজাণুহারক অলক্তিকা বা আলতা পরিয়ে দেওয়া নাপতিনিদের মধুর স্মৃতি! ইতিহাস বোধ হয় এইভাবেই গোলাকৃতি পথে বিচরণ করে।

উমা

আইরিডোলজি : এক আধুনিক ধাপ্পাবাজির নাম

সমীরকুমার ঘোষ

একটা জনপ্রিয় বাংলা গান আছে, 'কথা কিছু কিছু বুঝে নিতে হয়, সে তো মুখে বলা যায় না/ চোখের কথাই মনের কথা, চোখই মনে আয়না।' এ কবির বন্ধনহীন আবেগের উচ্চারণ। কিন্তু তলে তলে কবির কথাকে সত্যি করে তোলার যে প্রয়াস চলছে, তা কে জানত! 'আইরিডোলজি ইজ দ্য নিউ অ্যাস্ট্রোলজি। ডিসকভার ইয়োর সাইন।' একটা সাইনবোর্ডে এরকম উচ্চকিত ঘোষণা দেখে থমকে গেলাম। জায়গাটা জার্মানির হাইডেলবার্গে, হাইডেলবার্গ ফোর্টের কাছেই। দুর্গের নিচের এলাকাটা অনেকটা আধুনিক বাজারের মতো। তবে মাঝখানে সুন্দর গির্জা, বড় চত্বরের মাঝে অসাধারণ ভাস্কর্য রয়েছে। আর রয়েছে দু-দিকে নানান ধরনের দোকান। ভিনটেজ ওয়াইন থেকে পেন, ঘড়ি, খাবার বা পোশাকের দোকান। তারই ফাঁকে অবস্থান 'আইরিস গ্যালারির'র মাঝামাঝি থাকা ফোকর। ঝাঁ-চকচকে দোকান। নানা যন্ত্রপাতি। চারিদিকের দেওয়ালে চোখের আইরিস মানে কনীনিকার দুর্দান্ত সব রঙিন ছবি। আমাদের সিনেমা হলগুলোয় একসময় এক ধরনের লম্বাটে ওজনযন্ত্র রাখা থাকত। তার পা-দানিতে উঠে দাঁড়ালে চোখ বরাবর কাচের ফ্রেমের আড়ালে ঘুরত একটা চাকা, জ্বলত লাল-নীল আলো। মাঝামাঝি থাকা ফোকর দিয়ে পয়সা গলিয়ে দিলে উপরের চাকাটা ঘোরার পর ওজনের মাপ লেখা টিকিট বেরিয়ে আসত। মোটা পিচবোর্ডের টিকিট। কখনও টিকিটের পিছনে জ্যোতিষশাস্ত্রীয় ভবিষ্যদ্বাণীও থাকত। এখানেও দোকানের বাইরে তেমনই একটি যন্ত্র খাড়া করে রাখা। তাতে লেখা 'ডিসকভার ইয়োর আইরিস', নিচে লেখা 'ফ্রি ট্রায়াল'। একটা আয়নার মতো রয়েছে, তার দু পাশে দুটো লেন্স। আয়নাটার উপরে লেখা 'লুক অ্যাট ইয়োর আইরিস'। সেই আয়নার দিকে তাকালে তাতে চোখের ভিতরের ছবিটা দেখা যাবে। অনেককেই দেখলাম কৌতূহলবশত নিজের চোখের মণি দেখার চেষ্টা করছেন। দোকানি এক যুবক। তাকে জিজ্ঞেস করলাম, আইরিস দেখে ভাগ্য নির্ধারণ হবে কীভাবে? সে জানাল, বিভিন্ন অসুস্থতা, মানসিক উদ্বেগ-উৎকণ্ঠার ছাপ নাকি চোখের মণির মধ্যে পড়ে। চোখের ফটোগ্রাফ দেখে বিশেষজ্ঞরা বিশ্লেষণ করতে পারেন তাঁর কী রোগ হয়েছে এবং সেই অনুযায়ী নিদান দেন।

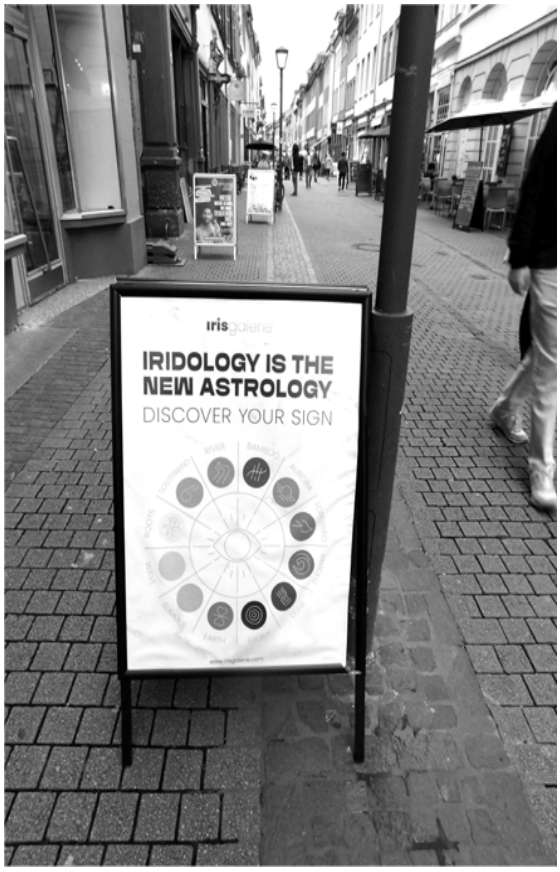

নিদেন যাদের বিদ্যের দৌড় মাধ্যমিক, তাদেরও নবম-দশম শ্রেণীর জীবনবিজ্ঞান বইয়ে চোখ অধ্যায় পড়তে হয়েছে। তাতেই কর্ণিয়া, আইরিস, পিউপিল, কনজাংটিভাস, রেটিনা ইত্যাদির অবস্থান ও কাজ তাদের জানা। তবু বলি, চোখের সামনের অংশে থাকে কর্ণিয়া, গম্বুজের মতো দেখতে। তার পিছন দিকে থাকে আইরিস। তাদের মাঝখানে থাকে এক ধরনের

তরল, যাকে বলে অ্যাকিউয়াস হিউমার। আইরিস চোখের রঙিন অংশ। চোখের ভিতরে কতটা আলো ঢুকবে তা পিউপিল, মানে চোখের মণি বা তারা মাঝের ছিদ্র ছোট-বড় করে নিয়ন্ত্রণ করে। আইরিসকে বাংলায় বলে 'কনীনিকা'। সেই কনীনিকা গিরেই গড়ে উঠেছে এক বিদ্যাচর্চার শাখা। না, এর সঙ্গে চক্ষুবিজ্ঞানের কোনো যোগ নেই। এটা অনেকটা জ্যোতিষ বা হস্তরেখাবিদ্যার মতো।

সাহেবদের দাবি, 'ফেস ইজ দ্য ইনডেক্স অব মাইন্ড'। মানে, মুখ মনের মুকুর। তবে চোখের সঙ্গে শুধু প্রেমেরই সখ্য। কারও অভিযোগ, 'মন্দ করেছে আমাকে ওই দুটি চোখে', কেউ সারাদিন 'ওই চোখে সাগরের নীল' খুঁজে চলেছে, তো কারও বিষাদ উচ্চারণ 'সেই দুটি চোখ আছে কোথায়'—উদাহরণ অসংখ্য। এমনকি 'গোপন কথাটি রবে না গোপনে, উঠিবে ফুটিয়া নীরব নয়নে', এমন দাবিও করেছেন কবীন্দ্র। কিন্তু কারো চোখ দেখে সে ক্রনিক আমাশয় রোগে ভুগছে কিনা, কিংবা একটু ঠাণ্ডা লাগলেই সর্দির ধাত কিনা বলে দেওয়ার কথা কোথাও শুনিনি। 'মৌচাক' ছবিতে গুলবাজ বাঁড়ুজ্জে চোখ দেখে মহাপুরুষের লক্ষণ ধরতে পারতেন। সে যাই হোক, কনীনিকাবিদ্যার দাবিদাররা কী বলছেন দেখি— ওদের প্রচারপত্রে তিনটি ধাপের কথা আছে। ফোটোগ্রাফি (Fotografie), অপটিমিয়েরুং (Optimierung) এবং কুন্সট্ড্রুক (Kunstdruck)। তিনটিই জার্মান শব্দ। প্রথমটা ইংরেজি ফটোগ্রাফিরই মতো। দ্বিতীয়টাকে ইংরেজিতে অপটিমাইজিং বলা যেতে পারে। এক্ষেত্রে একটা গাণিতিক প্রোগ্রাম, যার মাধ্যমে হাতে পাওয়া কিছু বিকল্প তথ্য থেকে সেরাটা বেছে নেওয়া যায়। 'কুন্সট্' মানে ললিতকলা। পুরো শব্দটার মানে আর্ট প্রিন্ট বা মুদ্রিত চিত্র। প্রথম ধাপে আইরিসের ছবি তোলা হয়। ওদের দাবি, আমরা কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই আপনার আইরিসের প্রতিটি 'শেড' ধরে ফেলব। দ্বিতীয় ধাপে, চোখের সৌন্দর্য ও অভিনবত্বকে আবিষ্কার করতে তোলা ফটোকে আরও উন্নত করা হয় এবং তৃতীয় ধাপে সেটিতে বৈচিত্র্য (এফেক্ট) যোগ করে, চাহিদামাফিক ছাঁদে (ফরম্যাট) চরম রূপ দেওয়া হয়। শেষমেশ সেটিকে পেশাদার শিল্পকর্মে পরিণত করা হয় গ্যালারিগুলিতে। তারপর বিশ্বের যে কোনো প্রান্তে পাঠানোর ব্যবস্থা করা হয়।

ও ে দ ব. আহ্বান---আসুন, আপনার চোখকে একখণ্ড শিল্পকলা করে তুলুন। এর জন্য খরচ পড়বে কমপক্ষে ৪৯ ইউরো (জার্মান ভাষায় 'অয়রো')। এক ইউরো আমাদের টাকায় একশো টাকারও বেশি। সেই হিসাবে প্রায় পাঁচ হাজার টাকা। এই টাকাটা খরচ করলে ওরা আপনার চোখের মণির একটা দুর্দান্ত সুন্দর ছবি উপহার দেবে, সেই সঙ্গে ভবিষ্যদ্বাণীও।

সাধারণত আমাদের চোখের মণি একটু ধূসর। নীল চোখের মানুষ কোনো কোনো জাতির মধ্যে দেখা যায়। বেড়ালের মতো হলদে ঘোলাটে চোখও অমিল নয়। যাদের কটা চোখ বলে। কেউ টাকা থাকলে তাঁর চোখের ভিতরের আইরিস বা কনীনিকা কতটা বর্ণিল জানতে বা দেখতে হাজার পাঁচেক টাকা গচ্চা দিতেই পারেন। তবে এর সঙ্গে আপনার চাকরিতে প্রোমোশন, ছেলের চাকরি, মেয়ের বিয়ে বা অম্বল-অজীর্ণ রোগ থেকে মুক্তির কোনো দিশাই যে মিলবে

না, তা বলাই বাহুল্য।

আইরিডোলজি বা কনীনিকাবিদ্যা ব্যাপারটাকে আধুনিক, ব্যক্তিগত এবং 'নতুন জ্যোতিষবিদ্যা' বলে দাবি করে বাজারজাত করছে কিছু ওয়েলনেস ও আর্ট ব্র্যান্ড। ওয়েলনেস সংস্থার উদ্ভব হয়েছে সম্প্রতি, আপনাকে-আমাকে সুস্থ রাখার জন্যই ওরা প্রাণপাত করে! এই রকম হিতৈষী সংস্থার মধ্যে আছে 'আইরিস গ্যালারি' এবং সিও (এসসিআইও) আর্ট। আইরিস গ্যালারির দোকানই হাইডেলবার্গে চোখে পড়েছে।

সংস্থাগুলোর দাবি : চোখের কনীনিকায় ১২ বা তারও বেশি 'আইরিডোলজিক্যাল সাইন' , মানে চিহ্ন দেখা যায়, যা থেকে ব্যক্তিত্ব, আবেগ এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির ভিতরকার প্রবণতা চিহ্নিত করা যায়। অনেকটা অ্যাস্ট্রোলজি বা জ্যোতিষবিদ্যার মতো এই নতুন বিদ্যা চোখের তারায় ধরা পড়া সঙ্কেত বিশ্লেষণ করে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে আত্ম-আবিষ্কারে এবং নিজের অভিনবত্ব বুঝতে সাহায্য করে।

ওদের বিচার্য বিষয় আইরিসের রঙ, বুনন (টেক্সচার) এবং নকশা (প্যাটার্ন)। সেগুলো দেখে বা বিশ্লেষণ করেই কারও নাড়িনক্ষত্র ব্যাখ্যা করা হয়। ব্যাপারটা অনেকটা জন্মকুণ্ডলী পাঠের মতো।

'আইরিটাইপস' ও সাইন : সিও আর্ট কোম্পানি ব্যক্তিকে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করে। যেমন, বালিয়ারি (ডিউন) বা শিখা (ফ্লেম)। এগুলো দেখে তারা ব্যক্তিত্বের রেখাচিত্র তৈরি (পার্সোনালিটি প্রোফাইলিং) করে। তাদের দাবি, এই বিদ্যা একেবারেই নতুন। এর সাহায্যে শারীরিক দুর্বলতাও নাকি বিশ্লেষণে ধরা পড়ে। সঙ্গে আধুনিক বিজ্ঞান-প্রযুক্তিকে মিশিয়ে দেওয়া হয় ব্যক্তির আবেগ বা 'আচরণগত' পর্যবেক্ষণের সঙ্গে।

এসব গালভরা দাবি স্বাভাবিকভাবেই বিজ্ঞানীরা গাঁজাখুরি বলে নস্যাৎ করে দিচ্ছেন। তাঁদের বক্তব্য, আইরিডোলজির শারীরিক অসুস্থতা নির্ণয়ের ক্ষমতা নেই। তাই এটিকে ভুয়ো বিজ্ঞান ছাড়া অন্য কিছুই বলতে তাঁরা রাজি নন। কেউ একধাপ এগিয়ে একে চিকিৎসা জালিয়াতিও বলছেন। বিজ্ঞানীদের দাবি, এতে মজা বা শৈল্পিক উপকরণ থাকতে পারে তবে বিজ্ঞানের নামগন্ধ নেই। জামা (জেএএমএ) অপথ্যালমোলজি-তে প্রকাশিত প্রতিবেদনে লেখা হয়েছে, বিস্তারিত পরীক্ষানিরীক্ষা চালিয়েও কোনো রোগলক্ষণের সূত্র পাওয়া যায় নি। বড়জোর এলোপাথাড়ি মন্তব্য কিছু কিছু মিলেছে। জানুয়ারি ২০০০ সংখ্যায় 'আইরিডোলজি, নট ইউজফুল অ্যান্ড পোটেনসিয়ালি হার্মফুল' (আইরিডোলজি একেবারেই কাজের নয় এবং ক্ষতিকর) শীর্ষক প্রতিবেদনের লেখক ই আর্নেস্ট, এমডি, পিএইচডি, এফআর সিপি (এডিনবরা) এ নিয়ে বেশ কয়েকজনের পরীক্ষানিরীক্ষার নথি পেশ করেছেন।

তাঁর লেখা থেকেই জানি, আমেরিকায় হাজারের বেশি নেচারোপ্যাথিক ফিজিশিয়ান আছেন। নেচারোপ্যাথে আইরিডোলজি এক গুরুত্বপূর্ণ রোগ নির্ণায়ক উপকরণ। অনেক আইরিডোলজিস্ট আবার মূল খাবারের পাশাপাশি আর কী খেতে হবে, যাকে ডায়েটারি সাপ্লিমেন্ট বলে তারও নিদান দেন। লতাপাতা খাওয়ারও পরামর্শ দেন। মার্কিন মুলুকে কনীনিকা বিশেষজ্ঞদের অনেক সংগঠনও গড়ে উঠেছে। ন্যাশনাল আইরিডোলজি রিসার্চ অ্যাসোসিয়েশন নামে একটা সংগঠনও আছে। 'ইন্টারন্যাশনাল অ্যাসোসিয়েশন অব আইরিডোলজিস্ট' হল ইউরোপীয় ধাঁচে কনীনিকাবিদ্যার প্রথম সারির সংগঠন। তারা আবার প্রশিক্ষণও দেয়। সেখানে কম করেও ৭২ ঘণ্টা ক্লাস করতে হয়। সিয়াটেলে বাসটিয়ার নেচারোপ্যাথিক কলেজে আইরিডোলজি হল মুখ্য বিষয়। তবে আমেরিকায় আইরিডোলজি সংক্রান্ত সমস্যা বিমার আওতায় পড়ে না। কিছু ইউরোপীয় দেশে অবশ্য সেটা আছে। যেমন জার্মানি। সেখানে ৮০ শতাংশ হাইলপ্রাকটিকার আইরিডোলজি চিকিৎসা করে। 'হাইলপ্রাকটিকার' হল সেই চিকিৎসকেরা, যাঁদের মেডিকেল ডিগ্রি নেই, এককথায় হাতুড়ে।

কনীনিকার রঙের অদলবদল দেখে শারীরিক অবস্থা নির্ণয়ের চেষ্টা শুরু হয় প্রায় ১০০ বছর আগে। আইরিডোলজি মনে করে, শরীরের সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ থেকে সূক্ষ্ম স্নায়ুতন্ত্র গিয়ে পৌঁছেছে আইরিসের উপরিভাগে এবং তাদের কাজেকর্মের কোনও গোলমাল হলে তার ছাপ গিয়ে পড়ে আইরিসে। এই তত্ত্ব অনুযায়ী শরীরের ডানদিকের অংশ যুক্ত ডান চোখের সঙ্গে, বাঁদিকটা বাঁ চোখে। আইরিডোলজিস্ট আইরিসের একটা মানচিত্র তৈরি করে। তাতে ঘড়ির ডায়ালের ধাঁচে প্রতিটি আইরিসকে ৬০ ভাগ করা হয়। এর প্রতিটি ভাগ শরীরের ভেতরের নির্দিষ্ট অঙ্গপ্রত্যঙ্গের কাজকর্মের সঙ্গে যুক্ত। যেমন হৃৎপিণ্ডের অসুখ ধরা পড়ে বাঁদিকের আইরিসেব ২টো থেকে ৩টি বাজার অবস্থানের পর্যালোচনা করে।

আইরিডোলজি কী আদৌ কাজ করে? এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে শুরু থেকে ধরে ১৯৯৮ পর্যন্ত MEDLINE, EMBASE এবং CISCOM-এর ডেটা বেস হাতড়ানো হয়েছে। সেই সঙ্গে সমসাময়িক ও বিকল্প চিকিৎসার বিশেষজ্ঞদের কাছ থেকে আরও রেফারেন্স চাওয়া হয়েছিল। পাশাপাশি আইরিডোলজির পেশাদার সোসাইটিকে তথ্য দিয়ে সাহায্য করার আহ্বানও জানানো হয়েছিল।

ডাঃ ই আর্নেস্ট জানিয়েছেন, খুঁজে পেতে আইরিডোলজি নিয়ে ৭৭টি আর্টিকেল পাওয়া গিয়েছিল। এগুলোর কপিও আনানো হয়েছিল। লেখাগুলোর শিরোনাম দেখেই বোঝা গিয়েছিল, এগুলো কোনো পরীক্ষামূলক পর্যবেক্ষণ থেকে লেখা নয়। ছাপা হয়েছিল ইংরেজি, জার্মান, ফ্রেঞ্চ, স্প্যানিশ এবং ইতালীয় ভাষায়। অন্য ভাষায় প্রকাশিত লেখাগুলির ইংরেজি সারসংক্ষেপ পড়া হত। পড়ে যদি মনে হত, এগুলো প্রাসঙ্গিক অনুসন্ধানে লাগবে, পুরো লেখাটার অনুবাদ সংগ্রহ করা হত।

৭৭টির বেশিরভাগই রিভিউ আর্টিকেলস, কমেন্টস এবং বিবরণমূলক। ১৭টি লেখাকে আলাদা করা হয়েছিল, এটা দেখতে যে তার মধ্যে আইরিডোলজির নির্ণায়ক মূল্যায়ন কতটা আছে। বেশিরভাগ তদন্তই করা হয়েছিল কোনো কনট্রোল গ্রুপ ছাড়া। কিছুক্ষেত্রে (কন্ট্রোল গ্রুপ নিয়ে বা ছাড়া) যাঁদের নিয়ে পরীক্ষা তাঁদের পরিচয় আড়ালে রাখা হয়েছিল। বৈজ্ঞানিক পরীক্ষানিরীক্ষায় কন্ট্রোল গ্রুপ খুব গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু এটা ছাড়াই এই সমস্ত পর্যবেক্ষণের সূত্রে আইরিডোলজিকে বৈধ নির্ণায়ক পদ্ধতি (ভ্যালিড ডায়াগনস্টিক টুল) বলে দাবি করেছিল। কিন্তু আদপে ছিল পুরোপুরি পক্ষপাতদুষ্ট।

সিমন ও তাঁর সহযোগীরা কয়েকজন কিডনি রোগীকে নিয়ে পরীক্ষা করেন। তাঁদের ক্রিয়েটিনিন মাত্রা ছিল খুব বেশি। আর কন্ট্রোল গ্রুপের কোনো কিডনির রোগ ছিল না। রোগীদের একটা গ্রুপ হিসাবে ধরে কাজ শুরু হয়েছিল, সেই সঙ্গে দুটো আলাদা সাব গ্রুপ ছিল। একদলের ক্রিয়েটিনিন ছিল অল্প বেশি। আরেকদলের খুব বেশি। কিডনি রোগীদের বেছে নেওয়া হয়েছিল সুবিধার জন্য, কারণ আইরিডোলজিবিদরা এদের নিয়ে মতামত দিতে বেশি পছন্দ করেন। রোগাক্রান্ত বা সুস্থ মিলিয়ে অংশগ্রহণকারী ১৪৬ জনেরই দুই চোখের কনীনিকারই ছবি তুলে তাদের সাঙ্কেতিকভাবে চিহ্নিত করা হয়। তারপর সেগুলোকে তিনজন কনীনিকাবিদ এবং তিনজন অপথ্যালমোলজিস্টকে দেখানো হয়। তাঁদের বলা হয় যাঁদের কিডনির রোগ আছে এবং যাঁদের নেই আলাদা ভাগ করে দিতে। ফলাফলে বেশিরভাগই ফলস নেগেটিভ এবং ফলস পজিটিভ হওয়ায় আন্দাজে বললে যেমনটা হত, তার বেশি কিছু পাওয়া যায় না। সিমন ও তাঁর সহকারী গবেষকেরা এই সিদ্ধান্তে আসেন, ছজন পরীক্ষাকারীর কেউই এই পরীক্ষা থেকে কোনো তাৎপর্যপূর্ণ পরিসংখ্যান তুলে ধরতে পারেন নি, চিকিৎসাক্ষেত্রে যার গুরুত্ব আছে।

নিপ্‌সচাইল্ড (Knipschild) নামে আরেকজন কন্ট্রোল পরীক্ষা চালিয়েছিলেন। তিনি পরীক্ষার জন্য বেছে নিয়েছিলেন ৩৯ জন গলব্লাডার প্রদাহের রোগীকে। পরে যেগুলো সার্জারির মাধ্যমে প্রমাণিতও হয়। যে সব রোগীর জন্ডিস ছিল, তাঁদের বাদ দেওয়া হয়। কন্ট্রোল পরীক্ষায় বয়স এবং লিঙ্গ দেখা হয়েছিল, তাঁদের গলব্লাডারের রোগের কোনও লক্ষণ বা চিহ্ন ছিল না। গলব্লাডার রোগী বেছে নেওয়া হয়েছিল, কারণ যোগদানকারী ছয় আইরিডোলজিস্ট

নিজেদের এই বিষয়ে এক্সপার্ট বলে দাবি করতেন। তাঁরা জানিয়েছিলেন, এই অবস্থা তাঁদের নজর এড়িয়ে যাওয়া একরকম অসম্ভব। প্রত্যেক রোগীর ডান চোখের স্টিরিও কালার স্লাইড নেওয়া হয়েছিল, কোড দিয়ে এবং এলোপাথাড়িভাবে (র‍্যান্ডম)। এগুলো আইরিডোলজিস্টদের দেখানো হয়েছিল। বৈধতা, সংবেদনশীলতা, নির্দিষ্টতা এবং ধারাবাহিকতা—বিচার করে দেখা যায়, পুরো ব্যাপারটা অনুমানভিত্তিক। কিছুই উল্লেখযোগ্যভাবে আলাদা করে প্রমাণ করে নি। পরীক্ষা থেকে নিপ্‌সচাইল্ডের স্পষ্ট সিদ্ধান্ত—আইরিডোলজি রোগ নির্ণয়ে কোনো কার্যকর উপায় নয়।

বুখানন এবং তাঁর সহকর্মীরা চার ধরনের রোগীর চোখের রঙিন ফটোগ্রাফ নিয়েছিলেন, যাঁরা আলসারেটিভ কোলাইটিস, করোনারি হার্ট ডিজিজ, অ্যাজমা ও সোরিয়াসিসে ভুগছেন। সেই সঙ্গে একটি কন্ট্রোল গ্রুপ ছিল। কন্ট্রোল গ্রুপ বয়স ও লিঙ্গ মিলিয়েই নেওয়া হয়েছিল। এই ফটোগ্রাফগুলো সাঙ্কেতিক চিহ্ন দিয়ে এক-একজন তদন্তকারীকে দিয়ে বিশ্লেষণ করা হয়েছিল দুভাবে—ম্যানুয়ালি এবং কম্পিউটার প্রোগ্রামিংয়ের সাহায্যে। নামী অইরিডোলজিস্টরা যে শর্ত তৈরি করেছিল সেই অনুযায়ীই সমীক্ষা হয়েছিল। দু ধরনের পদ্ধতি ব্যবহার করেই কেসগুলো এবং কন্ট্রোলের মধ্যে তেমন কিছু পার্থক্য ধরা পড়েনি। তাই গবেষকেরা সরাসরি সিদ্ধান্তে এসেছিলেন, আইরিডোলজিক্যাল বিশ্লেষণ পদ্ধতি এই রোগগুলো নির্ণয়ে কোনো কাজে লাগে নি।

ককবার্ন একটি অনিয়ন্ত্রিত এবং একটি ছোট নিয়ন্ত্রিত পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ করেন। তিন অংশগ্রহণকারীকে নেওয়া হয়েছিল স্বাস্থ্যবান এবং প্রকৃত রোগ থাকা অবস্থায়। তাঁদের একজন প্লুরিসি, একজন গ্যাস্ট্রোএন্টেরাইটিস এবং একজন আপার রেসপিরেটরি ট্র্যাক ইনফেকশনের রোগী। ওঁদের রোগের কথা গোপন করে চোখের ছাপ পরীক্ষা করানো হয়। কনীনিকাবিদরা ফটোগ্রাফ দেখে কোনোটাই সনাক্ত করতে পারেন নি।

এইরকম বহু পরীক্ষানিরীক্ষার পর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, রোগ নির্ণয়ের পন্থা হিসাবে আইরিডোলজি কোনো বৈধ পদ্ধতি নয়। কিবলার ও স্টারজিংয়ের মতো গবেষকেরা এক হাজার রোগী ও সুস্থ স্বেচ্ছাসেবীর প্রায় চার হাজার ফটোগ্রাফ নিয়ে বিস্তারিত ও কঠোর পরীক্ষা চালিয়ে জানিয়ে দেন, রোগ নির্ণয়ের উপকরণ হিসাবে আইরিডোলজি যে দাবি করে, তা তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়েছে। প্রাথমিক পর্বের কিছু মূল্যায়ন তো ছিল পদ্ধতিগত ভুলে ভরা।

আইরিডোলজি রোগই হোক বা ভাগ্য, তা নির্ধারণ করতে পারে না, এটা বহু পরীক্ষায় প্রমাণিত। শেষমেশ প্রশ্ন ওঠে, এটা কি ক্ষতিকর? বিজ্ঞানীরা জানাচ্ছেন অবশ্যই। প্রথমত এতে সময় এবং অর্থের অপচয় হয়। এ থেকে পাওয়া ফলস পজিটিভ ডায়াগনসিস, মানে রোগনির্ণয় এবং তার পরবর্তী পরীক্ষার পিছনে লোকে দৌড়ন, অথচ যে রোগের অস্তিত্বই নেই! প্রকৃত সমস্যা হয় ফল্‌স নেগেটিভের ক্ষেত্রে। কেউ অসুস্থ বোধ করে আইরিডোলজিস্টের কাছে গেলেন। তাঁকে পুরোপুরি সুস্থ বলে জানিয়ে দেওয়া হল। পরে দেখা গেল, তিনি গুরুতর রোগাক্রান্ত। এক্ষেত্রে আইরিডোলজিস্টের খপ্পরে পড়ে রোগ ধরা পড়ার প্রাথমিক পর্যায়ে চিকিৎসার সুযোগ না পেয়ে কেউ প্রাণও হারাতে পারেন। এই ধরনের কত সমস্যা কী হারে তৈরি হচ্ছে, তা জানার মতো পর্যাপ্ত ডেটা পাওয়া যায় না। তাই বাস্তব জীবনে আইরিডোলজি ঠিক কতজনের ক্ষতি করছে, তা নিয়ে সঠিক পরিসংখ্যান পেশ করাও মুশকিল। তবে এটা যে স্রেফ ধাপ্পাবাজি এবং এর খপ্পরে পরে লোকের সময়, অর্থ এমনকি প্রাণও যেতে পারে, তা সংশয়াতীতভাবে প্রমাণিত।

উ মা

কেন্দ্রীয় সংবাদপত্র রেজিস্ট্রেশন নিয়মাবলির (১৯৫৬) ৮ ধারা অনুযায়ী নিম্নলিখিত জ্ঞাতব্য বিষয় প্রকাশিত হল

১। প্রকাশস্থান : বি ডি ৪৯৪, সল্ট লেক, কলকাতা - ৭০০০৬৪

২। প্রকাশকাল : ত্রৈমাসিক

৩। প্রকাশক : বরুণ ভট্টাচার্য্য

৪। মুদ্রক : নিউ জয়কালী প্রেস

৫। মুদ্রণস্থান : দীনবন্ধু লেন, কলকাতা-৭০০০০৬।

৬। সম্পাদক : সমীরকুমার ঘোষ, ৫২/৫১, শশীভূষণ নিয়োগী গার্ডেন লেন, কলকাতা- ৭০০০৩৬।

আমি বরুণ ভট্টাচার্য্য এতদ্বারা ঘোষণা করছি যে, উপরোক্ত তথ্যগুলি আমার জ্ঞান ও বিশ্বাসমতে সত্য।

১ মার্চ, ২০২৬ বরুণ ভট্টাচার্য্য

প্রকাশক

আকাশে বিষ বাতাসে বিষ

শংকর ঘটক

‘আজ আমাদের ন্যাড়া পোড়া কাল আমাদের দোল, পূর্ণিমাতে চাঁদ উঠেছে বল হরি বোল’। একদমই নির্ভুল স্লোগান। এই প্রসঙ্গে পরে আসছি। তার আগে একটি গল্প শোনা যাক।

ন্যাড়া পোড়া হল দোল পূর্ণিমার আগের রাতে পালিত একটি প্রাচীন প্রথা, যেখানে শুকনো কাঠ, ডালপালা ও পাতা স্তূপ করে জ্বালানো হয়। মনে করা হয় যে এই অনুষ্ঠান অশুভ শক্তির বিনাশ ও শুভ শক্তির বিজয়ের প্রতীক। এটি উত্তর ভারতে হোলিকা দহন নামে পরিচিত এবং পুরাণ অনুযায়ী রাক্ষস রাজা হিরণ্যকশিপু ও তাঁর বোন হোলিকার পৌরাণিক কাহিনীর সাথে সম্পর্কিত। রাক্ষস রাজা হিরণ্যকশিপু তাঁর পুত্র প্রহ্লাদকে পুড়িয়ে মারার জন্য বোন হোলিকাকে আদেশ দেন, কিন্তু বিষ্ণুর কৃপায় প্রহ্লাদ রক্ষা পান এবং হোলিকা পুড়ে ছাই হয়ে যায়—এই বিজয়কে স্মরণ করে এই প্রথা পালন করা হয়। এটি ‘চাঁচর উৎসব’, ‘বুড়ির ঘর পোড়ানো’, বা ‘মেড়া পোড়ানো’ নামেও প্রচলিত। পশ্চিমবঙ্গ, ওড়িশা, বিহার ও ঝাড়খণ্ডসহ ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে এই প্রথা প্রচলিত। এই প্রথার ভয়ঙ্কর কুফল আকাশে বাতাসে বিষ বাষ্প ছড়িয়ে পড়া। অকালমৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাওয়া। আর সেই অন্তিম কালটি পেরিয়ে গেলেই সমস্বরে স্লোগান উঠবে ‘বল হরি বোল’। ন্যাড়া পোড়ারই বৃহৎ সংস্করণ নিয়ে এবার একটু ভাবা যাক।

১.

বছরে একবার খবরে আসে। প্রবল হৈ হট্টগোল হয়। কোর্ট থেকে ফের আরেকবার নির্দেশ আসে। দিল্লি সহ পাঞ্জাব হরিয়ানা লাগোয়া অঞ্চল বিষাক্ত দূষণে আক্রান্ত। ফসল কেটে নেবার পরে মাঠে পড়ে থাকা আনুমানিক দু কোটি টন উদ্ভিদাংশে আগুন জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে। এর ফলে ১২০ কিলোগ্রাম কার্বন মনোক্সাইড, ৩ হাজার কিলোগ্রাম কার্বন ডাই-অক্সাইড এবং ২ কিলোগ্রাম সালফার ডাই অক্সাইড বাতাসে মিশেছে। এর সাথে তৈরি হয়েছে ৪০০ কিলোগ্রাম ছাই আর অগুনতি ক্যানসার সৃষ্টি সক্ষম যৌগ। এখানেই শেষ নয়। আগুনের তাপে মাটিতে থাকা উদ্ভিদের জন্য প্রয়োজনীয় মৌল যেমন সোডিয়াম, পটাসিয়াম বা সালফার কমে যাবে, কৃষি-বান্ধব ব্যাকটেরিয়া ধ্বংস হয়ে যাবে।

দেখা যাচ্ছে ফসলটুকু কেটে নেবার পরে মাঠে যা পড়ে থাকে সেটাই যত সমস্যার কারণ। অর্থাৎ ফসলের সাপেক্ষে খড় হচ্ছে আবর্জনা বা বর্জ্য। এই বর্জ্যকে পোড়াতে গিয়েই যত বিপত্তি।

আরেকটি অতি চেনা উদাহরণ চাল কলের বর্জ্য। ধানের খোসা বা ধানের তুষ। মোটামুটি একটা হিসেব বলছে ধানের কুড়ি শতাংশই তুষ। চাল তো খাদ্য হিসেবে যাবে কিন্তু তুষটাকে নিয়ে কি হবে।

শুধু কৃষিক্ষেত্রেই নয়, প্রকৃতিতে বর্জ্যর অস্তিত্ব সব ক্ষেত্রেই। লৌহ নিষ্কাশনের সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে তৈরি হয় বর্জ্য — যা স্ল্যাগ নামে পরিচিত। অ্যালুমিনিয়াম নিষ্কাশনের বর্জ্য রেডমাড। সমস্ত ধাতব নিষ্কাশনেরই একই গল্প। জিঙ্ক কপার যা-ই হোক না কেন।

আবর্জনায় পরিণত হওয়া জৈব পদার্থ ভিত্তিক ব্যবহার্য সামগ্রী পুনঃপ্রক্রিয়াকরণের মাধ্যমে ফের ব্যবহারযোগ্য হয়ে ওঠে। এটা মোটামুটি জানা। কিন্তু অজৈব পদার্থভিত্তিক সামগ্রী যেমন সেরামিকের পাত্র ভেঙে গেলে অথবা ব্যবহারের অনুপযোগী হয়ে গেলে তার কি হবে। এমন কি সেরামিক সামগ্রী উৎপাদনের সময়ও বিভিন্ন কারণে এই ভেঙে যাবার ঘটনা ঘটে। স্বাভাবিক কারণেই ভেঙে যাওয়া জিনিসগুলো বর্জ্যেই রূপান্তরিত হয়।

আরও তিন ধরনের বর্জ্য আধুনিক জীবনযাত্রাকে হয়ত কিছুটা সংকটময় করে তুলবে অথবা ইতিমধ্যেই তুলেছে।

অন্যতম আধুনিক আবর্জনা ই-বর্জ্য। ই-বর্জ্য হল খারাপ হয়ে যাওয়া গৃহস্থালির ইলেকট্রিকাল এবং ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি, টিভি, কম্পিউটার, ফোন ইত্যাদি। ই-বর্জ্য বিপজ্জনক তালিকায় অন্তর্ভুক্ত কারণ এইসব যন্ত্র এবং যন্ত্রাংশে PCB এবং এমন সব ধাতু থাকে যেগুলো বিষাক্ত। আরেকটি বিপজ্জনক আবর্জনা চিকিৎসাসংক্রান্ত বর্জ্য। এই বর্জ্যে মানুষ এবং অন্যান্য প্রাণীদেহের অংশ, ওষুধ সহ অজস্র রাসায়নিক যৌগ, রোগজীবাণু, ব্যাক্টেরিয়া। আর আছে ভয়ঙ্কর তেজস্ক্রিয় বর্জ্য।

অতএব দেখা যাচ্ছে প্রয়োজনীয় দ্রব্যের উৎপাদনের হাত ধরে বেশ খানিকটা অপ্রয়োজনীয় পদার্থর জন্মলাভও

নিশ্চিত। কিন্তু বিজ্ঞানীরা বলেন বিশ্বে অপ্রয়োজনীয় বস্তু বা বর্জ্য বলে কিছু হয় না। আপাত বর্জ্য হয়ে উঠতে পারে ভবিষ্যতের সম্পদ।

পাঞ্জাব হরিয়ানা অঞ্চলের ফসলের বর্জ্য পুড়িয়ে পরিবেশ দূষিত করা প্রসঙ্গে যে কথাটি বলা যায় সেটি হল এই বিশেষ আবর্জনা ক্ষেত্রবিশেষে হয়ে উঠতে পারে অভাবিত সম্পদ। একই কথা প্রযোজ্য ধানের তুষের ক্ষেত্রেও।

সমস্যাটি মোটেই স্থানীয় নয়। সমস্যাটি গোটা দুনিয়ার। সভ্যতার অগ্রগতির সাথে সাথে রকমারি বর্জ্য পদার্থের আবির্ভাব হবে। বর্জ্যের পরিমাণও বাড়বে। বর্জ্যের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবার একমাত্র পথ বর্জ্য পদার্থকে কাঁচা মালের মতো ব্যবহার করে প্রয়োজনীয় পণ্যের উৎপাদন। ইতিমধ্যেই বিশ্বব্যাপী বেশ কিছু শিল্পপতি এই বিষয়ে আগ্রহ দেখিয়েছেন। কৃষিজাত পণ্য উৎপাদনের বর্জ্য ব্যবহার করে লাভজনক শিল্প প্রতিষ্ঠা করেছেন তাঁরা।

অন্যতম আধুনিক আবর্জনা ই-বর্জ্য। ই-বর্জ্য হল খারাপ হয়ে যাওয়া গৃহস্থালির ইলেকট্রিকাল এবং ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি, টিভি, কম্পিউটার, ফোন ইত্যাদি। ই-বর্জ্য বিপজ্জনক তালিকায় অন্তর্ভুক্ত কারণ এইসব যন্ত্র এবং যন্ত্রাংশে PCB এবং এমন সব ধাতু থাকে যেগুলো বিষাক্ত। আরেকটি বিপজ্জনক আবর্জনা চিকিৎসাসংক্রান্ত বর্জ্য। এই বর্জ্যে মানুষ এবং অন্যান্য প্রাণীদেহের অংশ, ওষুধ সহ অজস্র রাসায়নিক যৌগ, রোগজীবাণু, ব্যাক্টেরিয়া। আর আছে ভয়ঙ্কর তেজস্ক্রিয় বর্জ্য।

হরিয়ানা পাঞ্জাবের খড় আর বাঙলা-বিহার-ওড়িশার ধানের তুষ। এই বর্জ্য সম্পদ দুটির প্রয়োগ সম্ভাবনা তাক লাগিয়ে দেবার মতো।

২.

নভেম্বর-ডিসেম্বর সংবাদপত্রের শিরোনামে আসা দূষণ সৃষ্টিকারী পদার্থটি আসলে খড়। হরিয়ানা পাঞ্জাব উত্তরপ্রদেশের কৃষিপণ্যের জঞ্জাল অংশ পড়ে থাকে আবাদ ক্ষেত্রেই। জঞ্জাল অপসারণের সহজতম পথ তাতে আগুন ধরিয়ে দেওয়া। ফলাফল ভয়াবহ। সূক্ষ্ম ধূলিকণায় বাতাস দূষিত হয়। তার সঙ্গে মিশে থাকে শরীরের জন্য বিষাক্ত উদ্বায়ী জৈব যৌগসমূহ, কার্বন মনোক্সাইড, নাইট্রোজেনের অক্সাইডগুচ্ছ, সালফারের অক্সাইড। বিষের ছড়াছড়ি। তৈরি হয়ে যায় ওজোন যা আবার স্থানীয় অঞ্চলে ধোঁয়াশার সৃষ্টি করে।

এ তো গেল আকাশের কথা। আগুনের উত্তাপে জমির নাইট্রোজেন, ফসফরাস, পটাসিয়াম কমে যায়। জমিতে থাকা কৃষিবান্ধব জৈব পদার্থ এবং micro-organism ধ্বংস হয়ে যায়। অনেকটা মাটি পুড়েও যায়। অর্থাৎ, খড় পুড়িয়ে সবটাই ক্ষতি। তাহলে কৃষকরা নিজেদের ক্ষতি নিজেরাই করে কেন? করে মূলত তিনটি কারণে। পরের চাষের জন্য দ্রুত জমি ফেরত পাওয়া। বিকল্প যে পদ্ধতি জানা আছে তা অনেকটাই খরচ সাপেক্ষ। পশু খাদ্যের উপযুক্ত না হলে আর অন্য কোনো ব্যবহার না জানা। অথচ এই বর্জ্য পদার্থটির অসংখ্য ব্যবহার ইতিমধ্যেই উদ্ভাবিত হয়েছে। যেমন ধরা যাক পশুখাদ্য। সামান্য প্রক্রিয়াকরণ করলেই খড় পশুখাদ্যে পরিণত হয়।

মিশ্র সার উৎপাদনে খড়ের একটি বড় ভূমিকা আছে। জমির উর্বরতা বাড়াবার জন্য বর্তমানে vermicomposting প্রক্রিয়ার সাহায্য নেওয়া হয়। Indian agricultural research institute উদ্ভাবিত Pusa decomposer ব্যবহার করে উচ্চমানের মিশ্র সার উৎপাদন করা যায়, যেখানে আপাত বর্জ্য খড় একটি প্রয়োজনীয় কাঁচামাল। রাসায়নিক সারের আর প্রয়োজন থাকছে না।

দুটি প্রয়োজনীয় বস্তু এই বর্জ্যটি থেকে পাওয়া যায়। একটি হল ভোজ্য তেল এবং অন্যটি ইথাইল অ্যালকোহল। এই বর্জ্যটির অন্যতম প্রধান প্রয়োগ সম্ভাবনা শক্তি উৎপাদনে। বিশেষ প্রক্রিয়াকরণের মাধ্যমে বায়োগ্যাস প্রস্তুত করা যায়। বায়োগ্যাস ব্যবহার করে গৃহস্থালির রান্না থেকে আরম্ভ করে স্বল্প মাত্রার বিদ্যুৎ উৎপাদন সম্ভব। নিয়ন্ত্রিত প্রক্রিয়ায় তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রে কয়লার সঙ্গে মিশিয়ে সরাসরি বিদ্যুৎ উৎপাদনও সম্ভব এই বর্জ্য কাজে লাগিয়ে। এই পদ্ধতিতে ২৫ শতাংশ পর্যন্ত কয়লার সাশ্রয় সম্ভব হয়েছে। ফসলের বর্জ্য থেকে বায়ো গ্যাস উৎপাদন যেমন একটি লাভজনক প্রযুক্তি, ঠিক তেমনি লাভজনক বিশেষ এই বর্জ্যর দেহ থেকে আইসো প্রপানল, আইসো বিউটানল, ইথানল ইত্যাদি নিষ্কাশন।

শক্তি উৎপাদনের পরে যে কঠিন বর্জ্যটি পড়ে থাকে সেটা উচ্চগুণসম্পন্ন জৈব সার।

এই বর্জ্য কাগজ উৎপাদন শিল্পের জন্য উৎকৃষ্ট কাঁচা মাল; কারণ এর মধ্যে থাকা লিগনিনের মাত্রা কম আর সেলুলোজের মাত্রা বেশি। এই বর্জ্যের যে সমস্ত উপাদান দিয়ে গঠিত তার ৭০ থেকে ৮০ শতাংশই সিলিকা বা সিলিকন-ডাই-অক্সাইড। বিশুদ্ধ সিলিকা একটি মূল্যবান কাঁচামাল যা এখান থেকে সহজেই তৈরি করা যায়।

দেখা যাচ্ছে যে বস্তুটিকে আবর্জনা বা বর্জ্য বলা হচ্ছে সেটি আসলে সম্ভাবনাপূর্ণ একটি মূল্যবান কাঁচামাল। এত সম্ভাবনাপূর্ণ পদার্থটির আগুনে জ্বলে যাবার মতো মর্মান্তিক পরিণতি মেনে নিতে কষ্ট হয়। বাৎসরিক বহ্ন্যুৎসব, আকাশ বাতাস দূষিত, সব কিছু ছাপিয়ে উদ্ভাবনের অপমৃত্যু।

সরকার এগিয়ে এসেছে সরকারি সাহায্যের ডালি নিয়ে। দামি যন্ত্রপাতি কেনার জন্য সরকারি ভর্তুকি। বায়ো গ্যাস প্ল্যান্ট এবং প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো স্থাপনের জন্য অনুদান।

সরকারি সহায়তা ও সমর্থনে প্রতিটি গ্রাম, ব্লক অথবা জেলায় বর্জ্য ব্যাঙ্ক স্থাপিত হবে যেখানে কৃষক জমা দেবেন তাঁর বর্জ্য আর সেইগুলি সহজেই সংগ্রহ করতে পারবে কারখানার কর্তৃপক্ষ। কৃষকদের উৎসাহ দেবার জন্য খড়ের একটা বাজার তৈরি করে দেবে সরকার যা bio industries, bio coal এবং পশুখাদ্য উৎপাদনকারীদের অর্থনৈতিক সহায়তা দেবে।

বর্জ্য থেকে বিত্তর এমন স্বর্ণ সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও কদিন বাদে আবার খড় পুড়বে মাঠে। আদালত থেকে নির্দেশ আসবে। পরিবেশ আবার দূষিত হবে।

জনৈক বিজ্ঞানীর কথাটুকু সামান্য পালটে আমরা বলতেই পারি, এখন সময় এসেছে এই কথা বলার start earning instead of burning.

৩.

এবার আসা যাক ধানের কথায়। ধান থেকে চালের উৎপাদনে মোটামুটি ২০ থেকে ৩০ শতাংশ তুষ উৎপন্ন হয়। এই তুষ সরাসরি জ্বালানি হিসেবেই দীর্ঘদিন ব্যবহার হয়ে আসছিল। বাতাসে বিষাক্ত ধোঁয়া ছড়িয়ে পড়ছিল। এটাই ছিল এতদিনের পুরনো গল্প। গত কয়েক দশকের গবেষণা ধানের তুষ সম্পর্কে যাবতীয় ধ্যানধারণার ব্যাপক পরিবর্তন ঘটিয়েছে। ধানের তুষ এখন একটি মূল্যবান কাঁচামালে পর্যবসিত হয়েছে।

প্রথমেই ধরা যাক বাড়ি নির্মাণের জন্য নির্মাণ সামগ্রীর কথা। ধানের তুষ তাপরোধি অর্থাৎ তাপ পরিবহনে দুর্বল। ধানের তুষের এই ধর্মকে কাজে লাগিয়ে ঘরের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখা যায়। এর ফলে গ্রীষ্মকালে ঘর ঠাণ্ডা থাকবে আর শীতকালে থাকবে উষ্ণ। তুষ ব্যবহার করে মোটা টালি তৈরি করে তা দিয়ে ঘরে দেওয়াল এবং ছাদের ভেতরের অংশ আচ্ছাদিত করতে হয়।

ধানের তুষ নিয়ন্ত্রিতভাবে পুড়িয়ে নিলে যে ছাইটা পাওয়া তার নাম rice husk ash. এই বস্তুটির মধ্যে প্রধানত থাকে রাসায়নিকভাবে সক্রিয় অনিয়তাকার বা amorphous সিলিকা যা ধানের তুষকে অতি প্রয়োজনীয় বস্তুতে রূপান্তরিত করে। তুষের ছাই সাধারণ সিমেন্টকে আংশিকভাবে প্রতিস্থাপিত করতে পারে। এর ফলে অনেকটাই খরচ কমে। শুধু খরচ কমে না, এই মিশ্রণ ব্যবহার করে নির্মিত কংক্রিটের কাঠামোও তুলনামূলকভাবে হালকা অথচ বেশি শক্তিশালী হয়।

শক্তির উৎপাদনে ধানের তুষ একটি দক্ষ আর পরিচ্ছন্ন বিকল্প জ্বালানি। ধানের তুষ এই ক্ষেত্রে নানাভাবে ব্যবহার করা যেতে পারে। ব্রিকেট অথবা ছোট ছোট পেলেট বানিয়ে ধানের তুষকে বয়লার এবং ফার্নেস বা চুল্লির জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করা যায়। এর ফলে জীবাশ্ম জ্বালানির সাশ্রয় তো হবেই তার সাথে সাশ্রয় হবে অর্থের। জ্বালানি খরচ কমে যাবে অনেকটা। বয়লার থেকে উৎপাদিত তাপশক্তি অন্যান্য শিল্পে এমনকি সীমিত পরিমাণে বিদ্যুৎ উৎপাদনেও ব্যবহার করা যেতে পারে।

ধানের তুষ থেকে উৎপন্ন biochar কৃষিকাজে ব্যবহার করা যায়। biochar জৈব পদার্থ থেকে উৎপন্ন চারকোল। এই বস্তুটি বহু গুণসম্পন্ন। কৃষিজমিকে কৃষিকাজের জন্য প্রস্তুত করতে এর জুড়ি নেই। biochar সূক্ষ্মছিদ্র যুক্ত কার্বন বা অঙ্গার। সূক্ষ্মছিদ্র থাকার জন্য এই পদার্থ বেশি জল ধরে রাখতে পারে। পুষ্টির ভাঁড়ার গড়ে তুলতে পারে, প্রয়োজনে অল্পস্বল্প অক্সিজেন সরবরাহ করতে পারে আর জমিতে উপস্থিত কৃষিবান্ধব microbes-এর পরিচর্যায় সহায়তাও করতে পারে। ধানের তুষ, তুষের ছাই অথবা বায়োচার এই তিনটি পদার্থই পানীয় জল পরিশোধনে কার্যকর। জৈব দূষিত পদার্থই হোক অথবা লেডের মতো ভারি ধাতু-তুষ অথবা তার সাঙ্গোপাঙ্গরা চুম্বকের মতো টেনে ধরে। পাওয়া যায় পরিশোধিত পানীয় জল। ঘরে ব্যবহারযোগ্য দামি জল পরিশোধনের যে সমস্ত যন্ত্রপাতি বাজারে পাওয়া তাদের থেকে কোনো অংশেই কম কার্যকরী হবে না তুষের ছাই-এর

ফিল্টার। শুনতে আশ্চর্য লাগলেও ধানের তুষ দিয়ে কাগজ আর কাগজ দিয়ে বানানো অন্যান্য কাজের জিনিস বানানো যায়। গাছের একটি চমৎকার বিকল্প। তুষের একটি অসুবিধে এর লম্বা সেলুলোজ তন্তুর অভাব। কাগজ প্রস্তুত করার সময় তুষ মিশিয়ে দেওয়া হয়। এর ফলে যে কাগজ তৈরি হয় তা ছিঁড়তে গেলে বেশি শক্তি লাগবে। সামগ্রিকভাবে খরচ তো কমবেই। ধানের তুষের বহুমুখী প্রয়োগ সম্ভাবনা অবাক করার মতো। গবেষকরা তুষ নিয়ে গবেষণাটিকে নতুন মাত্রা দিয়ে চলেছেন। abrasive, filter high tech battery হাত ঘুরে cosmetics আর pharmaceuticals-এ পৌঁছে গেছেন। ধানের তুষের মতো সাধারণ একটি প্রথাগত বর্জ্যের একটি মহার্ঘ সম্পদে রূপান্তর চক্রাকার অর্থনীতি বা circular economy দিকে দৃষ্টান্তমূলক পদক্ষেপ। কৃষি জমির উর্বরতা বৃদ্ধি থেকে শুরু করে গৃহে জ্বালানির যোগান। বিদ্যুৎ উৎপাদন থেকে আধুনিকতম প্রযুক্তির কাঁচামাল সরবরাহ। পরিবেশ সুরক্ষা থেকে জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন। সর্বত্র একটি নাম ধানের তুষ।

শেষ পর্যন্ত চালের দামের থেকে তার বর্জ্যের দাম বেশি হয়ে যাবে না তো?

উমা

সাম্প্রতিক একটি সমীক্ষা থেকে জানা গেল বর্ধমান ও হুগলী জেলার কয়েকটি জায়গায় চালকল বর্জ্য দূষিত জল আশপাশের কৃষিজমিতে ছড়িয়ে পড়ছে। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে লাভজনক ব্যবসা করে চলেছে চালকল। কৃষকদের অভিযোগ এই বর্জ্য জল ও চালকলের ছাই পড়ে কৃষি জমির বিস্তীর্ণ অংশ ধীরে ধীরে তার উর্বরতা হারাচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গ দূষণ নিয়ন্ত্রণ পরিষদ-এর কাছে অভিযোগ জানিয়েও কোনো সুরাহা হয় নি। অনুর্বর বন্ধ্যা জমিতে চাষবাস না হলে কৃষক তা বিক্রি করে দিতে চাইবে। তখন সেই জমি চালকল মালিকরাই কিনে নেবে। রাজ্যের দূষণ নিয়ন্ত্রণ পরিষদের নির্দেশিকা না মেনে চালকল মালিকরা দিনের পর দিন এভাবেই কৃষিজমির ক্ষতি করে চলেছে।

সূত্র: এই সময় ০৫.১২.২০২৫

রোগা হতে চান? ধীরে চলুন

গৌতম মিস্ত্রী

জুলাই ২০২৪, প্যারিস অলিম্পিকের আসরে সোশ্যাল মিডিয়ায় ঝড় ওঠা একটি ঘটনা। মাত্র ১০০ গ্রাম ওজন বেশি বলে সম্ভাব্য স্বর্ণপদক হাতছাড়া হয়ে গেল, ইতিমধ্যে জয় করা রৌপ্যপদকও ছিনিয়ে নিল এক ভারতীয় তরুণীর। সেই খেলোয়াড়ের হতাশার চেয়েও অলিম্পিকের ময়দানের বাইরে দর্শক হিসাবে বসে থাকা ভারতীয় তথা বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায়কামী বিদগ্ধ লোকজনের খেদের আগুনের তেজ বেশি। সেই বিতর্কের অন্তিম পরিণতিতে আমজনতার ভূমিকা কেবল দর্শকের।

প্রাচীন রোমের কলোসিয়ামে গ্ল্যাডিয়েটরের নৃশংস লড়াইয়ের মতো ক্রুর না হলেও আধুনিক সভ্য মানুষের সেইরূপ কিছু আদিম উত্তেজনার উপায় চাই। সেই ক্রুর বিনোদনের জন্য সভ্য মানুষের জন্য উদ্ভাবিত — প্রতিযোগিতামূলক যে কোনো লড়াই, স্কুলের পরীক্ষা বাইরে শুল্কওয়ালা অলিম্পিয়াড ইত্যাদি পরীক্ষায় ঝলমল করার টানাপোড়েন বা পুরো মাত্রায় ব্যবসায়িক ক্রিকেটের লঙ ফিল্ম বা শর্ট ফিল্ম। পাড়ার, জেলার, দেশের ও সর্বোপরি আন্তর্জাতিক খেলায় পদক পাওয়ার লড়াইয়ে অ্যাড্রেনালিন নিষিক্তের ঘটনা ঘটেই থাকে। সেই ঘটনা চারপাশের দর্শকদের বা বহুদূরে টেলিভিশনের সামনে বসে থাকা লক্ষ-কোটি উত্তেজনা, বুভুক্ষু উপভোক্তাদের প্রাচীন অসভ্য রোমের কলোসিয়ামের দর্শকের মতো উত্তেজনা যোগায়। এখনও এই সব ঘটনা মানুষের চাহিদা মেটানোর খবর কাগজের হেডলাইন হয়। পৃথিবীতে মানুষের ক্ষুদ্র ক্ষণকালের অবস্থানকালে প্রতিযোগিতার উত্তেজনার চেয়ে বন্ধুত্বমূলক সহাবস্থান কাম্য হলেও অনন্তকাল ধরে সংখ্যালঘু রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বার্থওয়ালা মানুষের চাহিদায় সংখ্যাগুরু মানুষের স্বপ্নে ইনজেক্ট হয় উত্তেজক লড়াই। সেই বিতর্ক আলাদা। আমি অন্য এক বিতর্কের অবতারণা করতে চাইছি, যেটা অব্যক্ত রয়ে গেছে প্রচারের ভিড়ে।

সরাসরি আলোচ্য বিষয়ে আসি। একবিংশ শতাব্দীতে আমাদের দেশে এমন গরীব মানুষ মেলা ভার, যিনি পর্যাপ্ত খাবারের অভাবে রোগা হয়ে গেছেন। ধনী-গরীব কেউই আর রোগা নন। চরম বাতিকগ্রস্ত হাতে গোনা কয়েকজন কিছুতেই রসগোল্লা খান না, গ্রীষ্মের দাবদাহ আর ঝড়বৃষ্টির তোয়াক্কা না করে দৈনিক হাঁটার কোটা পূরণ না করে রাতে ঘুমাতে পারেন না। আমরা তাঁদের কথা বলব না। খেলোয়াড়ও নই, বাতিকগ্রস্তও নই, এমন সংখ্যাগুরু মানুষের একজন আমি। আমার কিসে ভাল হবে সেটা বেশি জরুরি নয় কী!

প্রতিযোগিতার আগে সাময়িকভাবে ওজন কমানোর জন্য অলিম্পিকে যে সব কাণ্ড করতে হয় সেটা আমজনতার জন্য বিপদের। হ্যাঁ ঠিকই পড়ছেন, অলিম্পিকে প্রবেশাধিকার পাবার জন্য যা কিছু করতে হয়, সেটা সবসময় স্বাস্থ্যকর হয় না। অলিম্পিকের খেলোয়াড় বনাম গ্ল্যাডিয়েটরের জীবিকার জন্য যে আপোস করতে হয়—আপনি স্বচ্ছল কিংবা অস্বচ্ছল, কিন্তু পরের বিনোদনের জন্য বাঁদর-নাচ নাচতে যাচ্ছেন না। আপনি সেটা করবেন কেন?

মাধ্যমিক স্কুলে পদার্থবিজ্ঞানে একটি প্রথম পাঠ—আমাদের পৃথিবীতে, আরও সঠিক করে বলতে গেলে মহাবিশ্বে পদার্থ বা শক্তি যেমন সৃষ্টি করাও যায় না, তেমনই বিনাশও করা যায় না। রান্নাঘরে উনুন বা ওভেনের উপরে এক ডেকচি জল ফোটালেন। ডেকচি খালি করে জল উবে গেল। এতে জল নামের পদার্থটির বিনাশ হল না। তরল জল, কেবল তরল অবস্থা থেকে জলীয় বাষ্প নামের জলের অন্য একটি ভৌত অবস্থায় পরিণত হল। এই জলীয় বাষ্প একদিন আকাশের মেঘ হবে, না হয়ে তার অন্য উপায় নেই, বৃষ্টি হয়ে আবার মাটিতে নামবে। সেই হারিয়ে যাওয়া জল আপনার ডেকচিতে হয়ত ফিরে আসবে না। আপনার ডেকচিতে আসবে অন্য ডেকচি, সাগর, নদী, পুকুরের, ডোবার বা নর্দমার জল।

তনুভার লাঘবের চেষ্টায় এই সূত্রটি মনে রাখতে হবে। পাতিলেবু, টক দই, জিমনেসিয়ামের ডায়াটেশিয়ানের প্রোমোট করা প্রোটিন বার, প্রোটিন পাউডার বা বিশেষ ব্র্যান্ডের ওটমিলের কোনোটাই শরীরের মেদ ঝরাতে পারবে না। পৃথিবীতে পদার্থবিজ্ঞানের নিয়ম চলে, চলে না অযৌক্তিক ব্ল্যাক ম্যাজিক। আমার আপনার শরীরের মেদভার কমাতে হলে শরীরের মেদ ঝরবে কেবলই পরিশ্রম করে, মেদ খরচ করে। কিছু ওষুধ আজকাল আবিষ্কৃত হয়েছে না খেটে রোগা হবার জন্য। সেগুলোর পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া যেমনি ভয়ংকর তেমনই খরচের।

দুই দশক আগে ওজন কমানোর জন্য বাজারে পাওয়া যেত আন্তর্জাতিক চিকিৎসাবিজ্ঞানের নিয়ন্ত্রক সংস্থার অনুমোদিত কিছু ওষুধ। সেগুলো বাতিল হয়েছে বাজারে আসার এক দশকের মধ্যেই। রিমোনাবান্ট (Rinonabant, Cannabinoid receptor antagonist) ওষুধ ওজন কমাতো একটা ভয়ঙ্কর আপসে। সেই ওষুধগুলো সুস্বাদু ও লোভনীয় খাবার ইচ্ছেটাই নিকেশ করত আমাদের আনন্দ উদ্রেককারী মস্তিষ্ক নিঃসৃত হরমোন, ডোপামিন কমিয়ে। ক্যানাবিস, মানে গাঁজা সেবন করলে মস্তিষ্কের যে অংশের সুড়সুড়িতে যে তুরীয় আনন্দের অনুভূতি হয়, মস্তিষ্কের সেই অংশকে অকেজো করে দেয় রিমোনাবান্ট। আনন্দের হরমোনের অভাবে, সুস্থ মানুষ অবসাদে ভোগেন। অবসাদ চরম হলে মানুষের বেঁচে থাকার ইচ্ছে চলে যায়, অনেকে আত্মহত্যা করেন। রোগা হবার এই ওষুধে সেটাই হচ্ছিল। তাই সেটা নিষিদ্ধ হল। সিবুট্রামিন, আমিনোরেক্স, ফেনফ্লুরামিন, ডেক্সফেনফ্লুরামিন, বেনফ্লুরেক্স (Sibutramin, Aminorex, Fenfluramin, Dexfenfluramine, Benflurex) বাতিল হল হার্টের রোগের ঝুঁকির জন্য। লরকাসেরিন (Lorcaserin) বাতিল হল ক্যান্সারের ঝুঁকির জন্য।

এই সময়ের জন্য অনুমোদিত ওজন কমানোর ওষুধ গুটিকয়েক--- ওরল্লিস্টাট (Orlistat,বাজারি নাম Reeshape)—সিমাগ্লুটাইড, লিরাগ্লুটাইড, টিরজেটিপাইড (Semaglutide, Liraglutide, Tirzepadite)।

সিমাগ্লুটাইড, লিরাগ্লুটাইড, টিরজেটিপাইড ইত্যাদি গ্লুকাগন লাইক পেপটাইড রিসেপ্টর-১ বন্ধার আদতে টাইপ২ ডায়াবেটিস রোগের এক ধরনের বেশ দামী ওষুধ, ডায়াবেটিস রোগ না থাকলেও অনেক ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যায়। রক্তের সুগার অল্প কমায়। সুগার কমানোর চেয়ে হার্ট ফেলিওর রোগ সহ হার্টের বিভিন্ন রোগে সুদূরপ্রসারী উপকার হয়। যতদিন ব্যবহার করা যায় ততদিন শরীরের কিছুটা ওজনও কমে। সিমাগ্লুটাইড ট্যাবলেট, আর অন্য দুটো ইনজেকশন। এক মাসের সিমাগ্লুটাইড-এর খরচ প্রায় ১২ হাজার টাকা। জি এল পি ১ ব্লকারের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া—খাবার ইচ্ছে কমে যাওয়া, বমি বা বমি বমি ভাব, পেট ব্যথা, পাতলা পায়খানা, প্যাঙ্ক্রিয়াসের প্রদাহ, পিত্তথলিতে পাথর ইত্যাদি।

উমা

উৎস মানুষ-এর পরবর্তী প্রকাশনা।

পুস্তক পর্যালোচনা

বইয়ের নাম : পরিবেশ দূষণ ও বিশ্ব উষ্ণায়ন

লেখক : ডঃ দিলীপকুমার দে

মূল্য: ৩৫০ টাকা

পৃষ্ঠা : ২০০

বিস্তৃত বিষয়বস্তুকে সংক্ষেপে তেইশ পরিচ্ছেদে আলোচনা করা খুব সোজা ব্যাপার না। ডঃ দিলীপকুমার দে তাঁর ২০০ পাতার ***পরিবেশ দূষণ ও বিশ্ব উষ্ণায়ন*** বইতে অন্তত সেই চেষ্টা করেছেন। যে যে বিষয়গুলো এই বইতে অলোচিত হয়েছে সেগুলো হল : পৃথিবীর দূষণ ও বিশ্ব উষ্ণায়ন, বিশ্ব সৃষ্টির ইতিহাস, পরিবেশ বিষয়টি কি? রাজনৈতিক বিষয়?, পৃথিবীর বর্তমান অবস্থাটা কেমন?, পরিবেশ আন্দোলন ও জলবায়ুর পরিবর্তন সম্মেলন, পরিবেশ বিজ্ঞানে উন্নয়ন প্রকৃতি, বসুন্ধরা দিবসে পরিবেশ আন্দোলনের একটা দিক, পৃথিবীর জীববৈচিত্র্যের বিপন্নতা, প্লাস্টিকের উপরেই দণ্ডায়মান বর্তমান সভ্যতা, ২৬তম জলবায়ু সম্মেলন, জলবায়ু সংকটটা কি?, ভারতের সংবিধান ও আমাদের পরিবেশ সংরক্ষণ, ভারত সরকার কর্তৃক পরিবেশ ও তার উপাদান সম্পর্কিত কিছু আইন, পরিবেশ ভাবনায় কৃষি, বিশ্ব উষ্ণায়ন ও জলসংকট, জীববৈচিত্র্যের রক্ষার প্রয়োজনের কারণ, ভারতবর্ষের নদীগুলির অবস্থা, ভারতবর্ষের পরিবেশ হন্তারক প্রকল্পগুলি, পরিবেশ দূষণ ও ভারত, দাবানলের উৎস সন্ধানে, বিশ্ব উষ্ণায়নে পশ্চিমবঙ্গে ঘটে যাওয়া ঘূর্ণিঝড়, ২৮তম বিশ্ব জলবায়ু সম্মেলন ও পৃথিবী ভাবনা, দূষণ এড়ানোর উপায়।

প্রত্যেকটা বিষয় নিয়েই সারা বিশ্বে এবং বিশেষ করে ভারতে অনেক আলোচনা হয়েছে এবং হচ্ছে। এক একটা পরিচ্ছেদ নিয়েই আস্ত একটা বই হয়ে যায়। ডঃ দে এই বিস্তৃত বিষয়বস্তুগুলো নিয়ে পাঠককে এক সাধারণ ধারণা দেবার চেষ্টা করেছেন। সভ্যতার অগ্রগতির অন্যতম মূল স্তম্ভ শিল্পায়ন। আর শিল্পায়নের হাত ধরে আসে পরিবেশ দূষণ এবং বিশ্ব উষ্ণায়ন। কাজেই উপরিল্লিখিত বিষয়গুলো একটা আরেকটার সাথে গভীরভাবে সম্পর্কযুক্ত। সে হিসাবে দেখতে গেলে বইটা পাঠককে ভাবাবে।

পরিচ্ছেদগুলো আরেকটু গোছানো হলে ভাল লাগত। অর্থাৎ প্রথমে বিশ্ব উষ্ণায়ন এবং জলবায়ু সম্মেলন, ইত্যাদি, তারপরে ভারতে এর প্রভাব ও সেই সম্পর্কিত বিভিন্ন আইন, কৃষি ইত্যাদি এবং সবশেষে পশ্চিমবঙ্গ সম্পর্কিত বিষয়। আশা করি পরের সংস্করণে এটা সংশোধিত হবে।

পরিশেষে, আরো বেশি তথ্যসূত্রের প্রয়োজন। যেমন IPCC, 2023:Summary for Policymakers, In:Climate Change 2023: Synthesis Report, https://science.nasa.gov/climate-change/what-is-climate-change/ এবং অন্তর্জালের বিভিন্ন সূত্র সহজেই ব্যবহার করা যেতে পারত। ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক ইতিহাস বইয়ের কোনো কোনো অংশে ব্যবহৃত হয়েছে সেগুলো জানতে পারলে পাঠকের সুবিধা হত।

প্রদীপ্ত গুপ্তরায়

উমা

সংগঠন সংবাদ

চুঁচুড়ার কৌতূহলী বিজ্ঞান সংস্থা ২৫ বর্ষপূর্তি উপলক্ষে কিছু গণমুখী কর্মসূচি নেয়। ডিজে বাজানোর বিরুদ্ধে এই বিজ্ঞান সংগঠন গত আট বছর ধরে লাগাতার প্রচারসভা চালিয়ে যাচ্ছে। হুগলী জেলার পুলিশ কমিশনার-এর কাছে ডেপুটেশন দিয়ে অবিলম্বে ডিজে নিষিদ্ধ করার দাবি তুলেছে। তাদের প্রতিবাদের ফলে জেলায় ডিজে বাজানো কিছুটা হলেও কমেছে। এছাড়াও চঁচুড়ার তিনটি খেলার মাঠ ঘিরে দিয়ে বেশিরভাগ সময়ে তালা মেরে রাখার প্রতিবাদ করা হয়। ওই মাঠগুলিতে নানান বয়সের ছেলেমেয়েরা নিয়মিত অনুশীলন করে। তা প্রায় বন্ধ হওয়ার মুখে। এলাকায় খেলার মাঠ না থাকলে ছেলেমেয়েরা নানান বাজে নেশার খপ্পরে পড়ে। কৌতূহলী সেদিকে নজর রাখতে জেলা জুড়ে জোরদার প্রচার চালায়। জনসমর্থন পেয়ে প্রচারাভিযান চাঙ্গা হয়ে ওঠে। আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে এর প্রভাব পড়তে পারে বলে অনেকেই মনে করেন। সংগঠনের উদ্যোগে বিভিন্ন স্কুলে কর্মশালার আয়োজন করা হয়। কোন্নগর হাই স্কুল, হুগলী জ্যোতিষচন্দ্র বিদ্যাপীঠে মোবাইল ও সোশ্যাল মিডিয়া স্কুল পড়ুয়াদের কী পরিমাণ ক্ষতি করে চলেছে তা নিয়ে সচেতনতা গড়ে তুলতে রতন রায়চৌধুরী, বিশ্বরূপ নিয়োগী, দিলীপ দে, রঞ্জিত শীল উদ্বেগ প্রকাশ করেন। গাছে পেরেক মারার বিরুদ্ধে কৌতূহলীর প্রতিবাদী আন্দোলন থেমে নেই। চুঁচুড়া ও চন্দননগরে সংগঠন দীর্ঘদিন ধরে এই কাজ করে চলেছে।

প্রতিবেদক প্রদীপকুমার দত্ত

উমা

প্রোমোটারের থাবায় অক্ষয়কুমার দত্ত-র বাসস্থান ও কর্মস্থান

বঙ্গীয় সাক্ষরতা প্রসার সমিতি গত ১২ এপ্রিল বালি রবীন্দ্র ভবনের রক্তকরবী মঞ্চে ‘বাংলায় বিজ্ঞানচেতনার অগ্রপথিক অক্ষয়কুমার দত্ত ও শোভনোদ্যান’ শীর্ষক একটি কনভেনশনের আয়োজন করে। বালিতে অক্ষয়কুমার দত্ত-এর বাসস্থান ও কর্মস্থান শোভনোদ্যানকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে এই কনভেনশন-এর আয়োজন করা হয়। লেখক ও প্রাবন্ধিক আশীষ লাহিড়ী, অধ্যাপক শক্তিসাধন মুখোপাধ্যায় প্রমুখ এই চিরস্মরণীয় মনীষীর বাসস্থান পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার তাৎপর্য নিয়ে আলোচনা করেন। আশীষ লাহিড়ী কীভাবে অক্ষয়কুমার দত্ত অসুস্থ শরীর নিয়েও স্রোতের বিপরীতে গিয়ে পথে নেমে সামাজিক কুসংস্কারের প্রতিবাদ করেছিলেন সেরকম কয়েকটি ঘটনার কথা উল্লেখ করেন। বাসস্থানটির ওপর যাতে প্রোমোটারের থাবা না পড়ে তার প্রতিবাদ করতে বিজ্ঞানমনস্ক মানুষদের সমবেত হবার আহ্বান জানান।

উমা

কেলেঘাইয়ে দূষণ

দক্ষিণবঙ্গের দুই মেদিনীপুরের বহু মানুষ-এর জীবন-জীবিকার সঙ্গে জড়িয়ে আছে কেলেঘাই নদী। নানান পেশার বিশেষ করে মৎস্যজীবীদের নির্ভরশীলতা প্রশ্নাতীত। খবরে প্রকাশ পূর্ব মেদিনীপুরের কেলেঘাই নদী মারাত্মক দূষণের কবলে। যেখানে আগে মাছ ধরে মৎস্যজীবীরা দৈনিক সাড়ে তিন-চারশো টাকা অনায়াসে আয় করতে পারতেন ইদানিং ১০০ টাকা উপার্জন করতে হিমসিম খেতে হচ্ছে। কেন এমন হল? পটাশপুর এক নম্বর ব্লকের অমরশী দু নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েত যেখানে কাপড় রং করার প্রায় ১৬টি কারখানা থেকে প্রতিদিন অশোধিত বর্জ্য জল কেলেঘাইতে মিশছে। ফলে মাছ ও অন্যান্য জলজ প্রাণী হারিয়ে যাচ্ছে। গত ২৭ জানুয়ারি পটাশপুর এক নম্বর ব্লকের বিডিওকে পূর্ব মেদিনীপুরের মৎস্যজীবী সমিতির পক্ষ থেকে স্মারকলিপি দিয়ে অবিলম্বে নদীকে দূষমমুক্ত করার ব্যবস্থা নেওয়ার কথা হয়েছে। নদীতে ঝাঁজি ও কচুরিপানা বেড়েই চলেছে ফলে জল ঠিকমতো প্রবাহিত হতে পারছে না। মৎস্যজীবীদের এই আবেদন প্রশাসনিক মহল কতটা গুরুত্ব দেয় তা দেখার। জলদূষণ এতটাই যে মৎস্যজীবীরা ও নদীর জল ব্যবহারকারীরাও জলে নামতে চাইছেন না। নামলেই গা-হাত-পা চুলকায়। রং কারখানা ছাড়াও বেশ কয়েকটি ইটভাটার নোংরা জল কেলেঘাইতে মিশে অবস্থা আরো খারাপ করে দিয়েছে। সব মিলিয়ে পূর্ব এমনকি পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার কয়েকটি এলাকার মানুষ যাদের দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে কেলেঘাই মিশে আছে তাঁরা অত্যন্ত বিপদের মধ্যে দিয়ে দিন কাটাচ্ছেন।

সূত্র : দি স্টেটসম্যান ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৬

উমা

উৎস মানুষ WB/EC 228 ISSN 0971-5800 RN. 37375/80 Rs. 30.00
৪৭ তম বর্ষ ২য় সংখ্যা এপ্রিল-জুন ২০২৬ ৩০.০০ টাকা

উৎস মানুষ পত্রিকা ও প্রকাশনার বইয়ের জন্য যোগাযোগ— সুমন্ত বিশ্বাস।
ফোন— ৯৪৩৩৭৭১৫৭৭/৯৪৩৩০৩৬৫৩৩

উৎস মানুষ পত্রিকা ও প্রকাশনার বইগুলি অনলাইনে অর্ডার দিলে পাওয়া যায়। যোগাযোগ—হারিত বুকস (অনলাইন) **haritbooks@gmail.com**
হারিতের ফোন নং — +৯১ ৮৩৩৬৯৪১১০৮

বাৎসরিক গ্রাহক চাঁদা বাবদ কলকাতা ২৫০ টাকা/ কলকাতার বাইরে ৩০০ টাকা পত্রিকার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে জমা দিতে হবে।

Punjab National Bank,
College Street Branch,
Kolkata - 700073.
UTSA MANUSH, SB ACCOUNT NO. 0083010748838.
IFSC NO. PUNB0008320

বছরের যে কোনো সময় গ্রাহক হওয়া যায়। মোবাইল নম্বর সহ পুরো ঠিকানা পত্রিকার ই-মেইলে অথবা হোয়াটসঅ্যাপে জানাতে হবে। কোন সংখ্যা থেকে গ্রাহক হতে চান তা উল্লেখ করতে হবে।

ওয়েবসাইট : **https://www.utsomanush.com**
ই-মেল : **utsamanush1980@gmail.com**
Facebook : https://www.facebook.com/

পুস্তক তালিকা

পাঁচমিশালি (সঙ্কলন)	১২০.০০
জল-জমি-জঙ্গলের খোঁজে: বোলান গঙ্গোপাধ্যায়	১৫০.০০
স্বাস্থ্যের সাতকাহন ১ম খণ্ড : গৌতম মিস্ত্রী	২০০.০০
আসুন কাণ্ডজ্ঞানে ফিরি: আশীষ লাহিড়ী	৮০.০০
চেনা বিষয় অচেনা জগৎ: সমীরকুমার ঘোষ	১৫০.০০
বাঁধ বন্যা বিপর্যয় (সংকলন)	২০০.০০
আহরণ (সংকলন)	২০০.০০
যে গল্পের শেষ নেই: দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়	১৮০.০০
প্রতিরোধ : সম্পা: (ঐ)	১৩০.০০
বিজ্ঞান অবিজ্ঞান অপবিজ্ঞান (সংকলন)	২০০.০০
বিজ্ঞান জ্যোতিষ সমাজ (সংকলন)	২০০.০০
বিবেকানন্দ অন্য চোখে/সমীক্ষা ও আরো কিছু বিতর্ক নিরঞ্জন ধর	১২০.০০
প্রমিথিউসের পথে (সংকলন)	৫০.০০
লেখালিখি: অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়	২০০.০০
যুক্তিবাদের চার সেনাপতি অনু : প্রতুল মুখোপাধ্যায়	৬০.০০
শেকল ভাঙা সংস্কৃতি (সংকলন)	১২০.০০
গুমোট ভাঙ্গার গান: ধ্রুবজ্যোতি ঘোষ	১৫০.০০
নিজের মুখোমুখি: রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য	৭৫.০০
এটা কী ওটা কেন (সংকলন)	৫০.০০
মূল্যবোধ (সংকলন)	৮০.০০
প্রেসিডেন্ট বুশ-এর এই যুদ্ধ: অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়	৩০.০০
বাংলা বন্ধ বা শেষের শুরু: হিমানীশ গোস্বামী	৪০.০০

প্রাপ্তিস্থান : পাতিরাম, সেতু প্রকাশনী, ২ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, অমর কোলে (বিবাদী বাগ), সুনীল কর (উল্টোডাঙা), কল্যাণ ঘোষ (রাসবিহারী মোড়), মনীষা গ্রন্থালয় (কলেজ স্ট্রীট), ক্রান্তিক (কলেজ স্ট্রীট), রথীনদা (গোলপার্ক). ন্যাশনাল বুক এজেন্সি (সূর্য সেন স্ট্রীট) । জ্ঞান বিচিত্রা ১৮বি/১বি, টেমার লেন। প্রতিক্ষণ, ৫ সূর্য সেন স্ট্রীট।
হারিত বুকস (অনলাইন) haritbooks@gmail.com

উৎস মানুষ সোসাইটির পক্ষে বরুণ ভট্টাচার্য কর্তৃক বি ডি ৪৯৪, সল্টলেক, কলকাতা- ৭০০ ০৬৪ থেকে প্রকাশিত এবং দি নিউ জয়কালী প্রেস, ৮এ, দীনবন্ধু লেন, কলকাতা- ৭০০ ০০৬ হইতে মুদ্রিত।